কথামৃত — ত্রয়োদশ পর্ব

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on SriSriRamkrishnakathamrita
before the students of RKMVERI - Deemed University, Belur Math
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পেনেটীর মহোৎসবক্ষেত্রে রাখাল, রাম, মাস্টার ভবনাথ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর সংকীর্তানন্দে — ঠাকুর কি শ্রীগৌরাঙ্গ?

মাস্টারমশায় বর্ণনা করছেন —**ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পেনেটীত মহোৎসবক্ষেত্রে বহুলোকসমাকীর্ণ রাজপথে সংকীর্তনের দলের মধ্যে নৃত্য করিতেছেন। বেলা একটা হইয়াছে। আজ সোমবার, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি, ১৮ই জুন, ১৮৮৩**। (পৃঃ২২৩)

কথামৃতের এই অংশটা খুব সুন্দর। বলছেন, ঠাকুরকে দেখার জন্য চারিদিকে লোক কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেশবচন্দ্র সেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ঠাকুরের সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেছেন। সেই সব প্রবন্ধাদি থেকে অনেক লোক ঠাকুরের সম্বন্ধে অনেক কথা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন। মাস্টারমশাই খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন, **ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতেছেন, কেহ কেহ ভাবিতেছে শ্রীগৌরাঙ্গ কি আবার প্রকট হইলেন। চুতুর্দিকে হরিধ্বণি সমুদ্রকল্লোলের ন্যায় বাড়িতেছে। চতুর্দিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও হরির লুট পড়িতেছে।**

এই জিনিসটা খুন unusual। কেন? আগের পর্বে আত্মার সাক্ষাৎকার, পাপ-পূণ্য, কর্ম, মায়ের ভক্ত এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করছিলাম। সেখান থেকে 'তারা তারা দু-ভাই এসেছে রে' দিয়ে শুরু হল। আমরা যদি ধর্ম-ইতিহাসের দিকে তাকাই, উপনিষদ আদি যদি পড়ি, উপনিষদের ভাবই হল শান্ত ভাব; যাঁরা উপনিষদ পড়বেন তাঁরা শান্ত হয়ে যাবেন। মহাভারতে আমরা ঋষিদের যে বর্ণনা পাই, সবাই শান্ত ভাবের। এক-আধজন কোথাও কোথাও আছেন যাঁরা আনন্দে নৃত্য করছেন। ভগবান শিবের যে বর্ণনা সেখানে বলছেন, ভগবান শিব কখন শব হয়ে পড়ে আছেন, আবার কখন রামনামে নৃত্য করছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলাতে নৃত্য করেছেন ঠিকই, কিন্তু তারপরে সবটাই তাঁর জ্ঞানের উপর দিয়ে চলে। এখানে আমরা দেখছি ঠাকুরের সব কিছু মুহুর্তের মধ্যে পাল্টে যাচ্ছে।

কেউ কেউ ভাবছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ কি আবার প্রকট হয়েছেন? সেই সময় শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ প্রভু, এনাদের আধ্যাত্মিক তরঙ্গের প্রভাবে মানুষের মন খুব বেশি প্রভাবিত ছিল। এখনকার দিনে হয়ত এ-কথা অতটা বলা যায় না, কারণ এখন ঠাকুর নিজেই একজন মাপকাঠি হয়ে গেছেন।

সংকীর্তনতরঙ্গ রাঘবমন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সেখানে পরিক্রমণ ও নৃত্য করিয়া ও শ্রশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহের সম্মুখের প্রণাম করিয়া, গঙ্গাকুলের বাবুদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বাড়ির দিকে এই তরাঙ্গায়তি জনসজ্ঘ অগ্রসর হইতেছে।

পানিহাটির এই উৎসবকে সবাই রাঘব পণ্ডিতের চিড়ার মহোৎসব বলে। বৈষ্ণবদের কাছে চিড়া মহোৎসব খুব নামকরা। রাঘব পণ্ডিত চৈতন্য মহাপ্রভুর সময়কার একজন উচ্চমানের ভক্ত ছিলেন। দাস রঘুনাথ প্রথম এই চিড়ের উৎসব শুরু করেছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে বলেছিলেন, ওরে চোরা বাড়ি থেকে পালিয়ে পালিয়ে এসে এখানে তুই প্রেম আস্বাদন করিস; আজ তোকে দণ্ড দিব, তুই চিড়ার মহোৎসব করে ভক্তদের সেবা কর। সেই থেকে চিড়ের উৎসব চলছে।

ঠাকুর প্রতি বছরেই এই উৎসবে যোগদান করেন। আজও এখানে রাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে আসবার কথা ছিল। গাড়িতে একসাথে অনেকেই আসছেন, আসার সময় সবাই খুব হাসিমজা করতে করতে আসছেন। মাস্টারমশায় বলছেন –**ঠাকুর ছোকরা ভক্তদের সঙ্গে অনেক ফষ্টিনষ্টি করিতে লাগিলেন**। কিন্তু যেমনি পেনেটীর মহোৎসবক্ষেত্রে গাড়ি পৌঁছেছে সবাই অবাক হয়ে দেখছেন –ঠাকুর গাড়িতে এই আনন্দ করছিলেন, হঠাৎ একাকী নেমে তীরের ন্যায় ছুটে যাচ্ছেন। **তাঁরা অনেক খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন যে, নবদ্বীপ গোস্বামীর সংকীর্তনের দলের মধ্যে ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন ও মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতেছেন**।

এখানে আমরা আমাদের একটা পুরনো আলোচনাকে নিয়ে আসছি। এরপর চৈতন্য মহাপ্রভুর বর্ণনা আসবে, যেখানে অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা ও বাহ্যদশার কথা বলা হবে। বাহ্যদশায় মহাপ্রভু কথা বলতেন, অর্ধবাহ্যদশায় নৃত্য করতেন আর অন্তর্দশাতে সমাধিস্থ। এই তিনটে দশা ঠাকুরের তো আছেই, কিন্তু ঠাকুরের যেটা বৈশিষ্ট্য, তিনটেই একসঙ্গে হচ্ছে। বলছেন, আত্মার সাক্ষাৎকার না হলে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না। আবার বলছেন, কর্মফল আছে, কিন্তু ভক্তদের কর্মফল নেই। ঠাকুর যে এত রকম কথা বলছেন, কথাগুলোর মধ্যে যে ভক্তির কথা টগবগ করছে, তা না। ঠাকুর যে কথাগুলো বলছিলেন, এগুলো জ্ঞানীদের কথা। গীতার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য ঠিক এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। জ্ঞানীরা যখন কোন অন্যায় কর্মে বা সংসার কর্মে লিপ্ত হন, তখন তাঁর মনে একটা গ্লানির ভাব আসে। খুব দুঃখসহ তাঁরা ভাবেন – আমার সংস্কার আমাকে দিয়ে এখনও এইসব করাচ্ছে। অথচ অজ্ঞানীরা সেখানে আনন্দ করে, রমণ করে। সেখান থেকে ঠাকুর ভক্তিতে কোথায় লীন হয়ে যাচ্ছেন। আচার্য শঙ্করের নামে বলা হয়, অদ্বৈতের ব্যাপারে তিনি এত কিছু লিখেছেন, আবার সাথে সাথে তিনি এত সুন্দর সুন্দর দেবদেবীর স্তব রচনা করেছেন, এটাই আচার্য শঙ্করের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট।

কিন্তু আমরা কোথাও শুনিনি শঙ্করাচার্য মহাপ্রভুর মত এই রকম নৃত্য করে বেড়াচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এক মুহুর্তে শঙ্করাচার্যের মত কথা বলে যাচ্ছেন, আর তার পরের মুহুর্তেই তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর মত নৃত্য করছেন। এই ভগবান বুদ্ধের মত তিনি জ্ঞান, বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন, আবার এই মুহুর্তে তিনি চৈতন্য মহাপ্রভু বা রাসলীলার সময় শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সাথে যেভাবে নৃত্য করতেন, সেইভাবে নৃত্য করে যাচ্ছেন। এই দৃশ্য আমরা ধর্মের ইতিহাসে কোথাও দেখিনি। উপর থেকে নিচ পর্যন্ত বাইরে যত ধর্মগুরু ও প্রবর্তক হয়েছেন, ভারতে যত ধর্মগুরু ও প্রবর্তক হয়েছেন, এটা কোথাও নেই। ঠাকুরকে যখন অবতার বরিষ্ঠ বলা হয়, এর জন্যই বলা হয়। অন্যান্য অবতাররা একটা ভাব নিয়েছিলেন, যেমন কুর্মাবতার, সেখানে তমস ভাবকে অবলম্বন করেছিলেন। তেমনি শ্রীরাম অবতার, বুদ্ধ অবতার, তারও আগে কপিল অবতার, সবাই একটা ভাবকে নিয়ে এগিয়ে গেছেন।

কিন্তু ঠাকুর হলেন ভাবসাম্রাজ্যের রাজা। যখন কথা বলছেন, ফষ্টিনষ্টি করছেন; বাইরে থেকে কেউ দেখলে ঠাকুরকে ভাববেন, ইনি তো বেশ রসালো লোক। একটু পরেই আবার কোন প্রসঙ্গে গভীর জ্ঞানের কথায় ঢুকে যাচ্ছেন। কথামৃতের প্রথমের দিকে ঠিক এই জিনিসটাকে বর্ণনা করতে গিয়ে মাস্টারমশাই লিখেছেন –ইনিই কি এতক্ষণ প্রাকৃতলোকের ন্যায় ফষ্টিনষ্টি করছিলেন। আর সেখান থেকে তিনি এখন কি করছেন –'তারা তারা দুভাই এসেছে রে' গানের সাথে নৃত্য করে আনন্দ করছেন। আপনারা যাঁরা এই গানগুলো শুনেছেন তাঁরা জানবেন, এই ধরণের ভক্তির গান শুনলে মনটাকে কি রকম উপরে টেনে নিয়ে চলে যায়। তফাৎ হল, আমার আপনার মন কিছুক্ষণের জন্য উপরে যাবে, সেখান থেকে নামতেও বেশিক্ষণ লাগবে না। কিন্তু ঠাকুরের ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না, ঠাকুরকে সমাধিতে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ভাবে পুরো মাতোয়ারা, আনন্দে টগবগ করছেন। এই দৃশ্য ধর্মের জগতের ইতিহাসে কোথাও নেই, এ এক বিরল দৃশ্য।

স্থূল জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ, কারণ জগৎ আর মহাকারণ –স্থূল জগৎ মানে এই পৃথিবীতে আনন্দ করা, লোকেদের সঙ্গে আনন্দ করা, ঈশ্বরীয় কথা বলে আনন্দ করা। সেখান থেকে মন আস্তে আস্তে সূক্ষ্ম জগতে যায়। সূক্ষ্ম জগৎ থেকে মন একটু কারণ জগতে চলে আসে, মাঝে মাঝে মন একটু সূক্ষ্ম জগতে ঢুকে যাচ্ছে। তখন তিনি ভাবে ডুবে যাচ্ছেন, নৃত্য করছেন, নিজের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। সেখান থেকে মন চলে গেল মহাকারণে। মহাকারণে চলে গেল মানে, তিনি এখন সমাধিস্থ। কিন্তু এরপর সেখান থেকে যখন ফেরৎ চলে আসছেন, ফেরৎ চলে আসার পর তিনি যে কথাগুলো বলছেন সেখানে তিনি মহাকারণের কথা বলছেন, কারণ জগতের কথা বলছেন, জ্ঞানের কথা বলছেন, আত্মার কথা বলছেন। আত্মার কথা যখন বলছেন, মহাকারণের কথা; যখন ভক্তির কথা বলছেন, কারণ জগতের কথা। সেখান থেকে আর-একটু নেমে যখন বলছেন, 'ভক্তির তমো আনো', এগুলো সূক্ষ্ম জগতের কথা। আর যখন ফষ্টিনষ্টি করছেন, তখন স্থূল জগতে বিচরণ করছেন। ঠাকুরের এই যে চারটে স্তরে অনায়াস বিচরণ; লুডো খেলার মত, এক বললে এক, ছয় বললে ছয়, লাগ ভেলকি লাগ। এগুলো ধারণা করা খুব কঠিন।

আমারও বয়স এক সময় কম ছিল, প্রথমের দিকে আমিও যখন এগুলো পড়তাম, খুব ভাল লাগত। ঠাকুরের যেমন বলছেন –কচ্ছপ যেমন জলেও থাকে ডাঙাও থাকে; তখন পড়ে মনে হত, বাঃ ঠাকুরের কি দৃষ্টি! কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! কিন্তু এখন আর ওই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দিকে দৃষ্টি যায় না। উনি কি বলতে চাইছেন এটা ভেবেই অবাক লাগে। এই যে তিনটে জগৎ বা মহাপ্রভুর কথা বলতে গিয়ে যখন বাহ্যদশা, অর্ধবাহ্যদশার কথা বলছেন, ঠাকুর সব কটি দশায় অনায়াসে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছেন। শুধু বাংলাতেই না, ভারতে যত ভক্তিমার্গের সাধকরা ভক্তিমূলক গান রচনা করে গান করতেন, ঠাকুরও ওনাদের মত গান করছেন, আর ওখান থেকে ডুবে যাচ্ছেন। এমন ডুবে যাচ্ছেন যে, মুহূর্তের মধ্যে আত্মজ্ঞানে ডুবে যাচ্ছেন।

মাস্টারমশাই বলছেন, **সংকীর্তনের দলের মধ্যে ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন ও মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতেছেন**। এই যে কেমন ডুবে যাচ্ছেন, তখনও চেষ্টা করছেন নিজেকে ধরে রাখতে, কিন্তু ডুবে যাচ্ছেন। যেমন আমাদের যখন ঘুম পায়, তখন একটু কথা বলছে, বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ছে, আবার দু-একটা কথা কানে ভেসে আসছে, তখন আবার কথা বলার চেষ্টা করছে। ঠাকুরের ঠিক সেই রকম অবস্থা, সমাধিতে মনটা লীন হয়ে যাচ্ছে, আবার ওখান থেকে যেন জোর করে ধরে নিয়ে আসছেন। বলছেন, **পাছে পড়িয়া যান শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ গোস্বামী সমাধিস্থ দেখিয়া তাঁহাকে অতি যত্নে ধারণ করিতেছেন। আর চতুর্দিকে ভক্তেরা হরিধ্বণি করিয়া তাঁহার চরণে পুষ্প ও বাতাসা নিক্ষেপ করিতেছেন ও একবার দর্শন করিবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছেন**। উপনিষদে তাঁকে *রসোবৈঃ সঃ* বলছেন, তিনি রসস্বরূপ, তিনি আনন্দস্বরূপ। ঠাকুর সেই রসের মূর্তরূপ। চৈতন্য মহাপ্রভুর বর্ণনাদিতে আমরা এই রকম দৃশ্য পাই ঠিকই, কিন্তু ঠাকুরের বর্ণনার দৃশ্যগুলি বেশি historically recorded, ছোট ছোট কথা ও বর্ণনা দিয়ে মাস্টারমশায় একেবারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মিনিট মিনিটের বর্ণনা দিয়েছেন। এটা যে কোন বর্ণনা দিচ্ছেন বা কারু কাছ থেকে শুনে নিয়ে পরে বর্ণনা করছেন, তা নয়। ভক্তিরসে যদি কেউ ডুবে যায়, ঠাকুরের সাধনাতে যদি কেউ ডুবে থাকে, তাহলে সে কি পাবে? পাবে জ্ঞান, যার কথা ঠাকুর একটু আগে বলছিলেন –আত্মার সাক্ষাৎকার হলে সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন হয়, আর পাবেন এই প্রেমরস। যেটাকে পেলে সমস্ত কিছু ভুল হয়ে যায়।

ঠাকুরের কোন হুঁশ নেই, কে তাঁর দিকে তাকাচ্ছে, কে তাকাচ্ছে না, পাশে কে আছে, কে নেই, কোন হুঁশ নেই; নিজের মত তিনি নৃত্য করে যাচ্ছেন। এই বর্ণনাগুলো যেমন আমাদের হৃদয়কে একটা জানান দিয়ে দেয় কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে, ঠিক তেমনি এগুলোই আবার হয়ে যায় গভীর ধ্যানের বিষয়। লীলাচিন্তন শব্দ আমরা অনেকবার ব্যবহার করেছি। ঠাকুরের উপর সব সময় ধ্যান করা যায় না, ধ্যানও ভাল হয় না; তখন এই চিত্রগুলিকে গভীর ভাবে চিন্তন করতে হয়। ঠাকুর কিভাবে দক্ষিণেশ্বর থেকে গাড়ি করে ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ করতে করতে পানিহাটি যাচ্ছেন। যেতে যেতে মজা করছেন,

ঠাকুরের মজাগুলোও খুব রসালো হত। মেলা দেখলে বাচ্চা যেমন দৌড়ে মেলাতে প্রবেশ করতে যায়, উৎসবের ওই সংকীর্তন দেখে ঠাকুর এক দৌড়ে কীর্তনীয়াদের দলে ঢুকে নৃত্য করতে শুরু করে দিলেন। **ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশায় নৃত্য করিতেছেন। বাহ্যদশায় নাম ধরিলেন**। মনটা একটু নিচে যখন নামছেন, তখন তিনি নাম ধরলেন, মানে গান করতে লাগলেন –যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, ওই তারা তারা দুভাই এসেছে রে।

ঠাকুরের সঙ্গে সকলে উন্মত্ত হইয়া নাচিতেছেন, আর বোধ করিতেছেন, গৌর-নিতাই আমাদের সাক্ষাতে নাচিতেছেন। বৈষ্ণবরা সাধারণত এভাবেই কীর্তন করেন। সমস্যা কি হয়, উচ্চ আধার না হলে, যেমনি কীর্তনাদি শেষ হয়ে গেল, মনটা নেমে আসে আর তখন কামভাব খুব বেশি মাত্রায় বেড়ে যায়। সাধারণ ভক্তদের মধ্যে প্রশ্ন আসতে পারে, মঠের মহারাজরা তো ঠাকুরেরই সন্তান, ঠাকুর এত নৃত্য করতেন, এনারা কেন করেন না? একেবারেই যে করেন না তা না, বছরে এক আধদিন একটু করেন। কারণ এই ভাবে কীর্তনের মধ্যে ডুবে যাওয়াটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এগুলো হল, কৃত্রিম ভাবে কুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে দেওয়া বা বলা যেতে পারে, ইমোশানালি জিনিসটাকে উপরে নিয়ে যাওয়া। ইমোশানালিতে কি হয়, ওখান থেকে কিভাবে কখন যে ধাপাস্ করে পড়বে কেউ বলতে পারবে না, কিন্তু পড়বেই। আমরা আমাদের বড়দের মুখে আমরা এই ধরণের কথা অনেক শুনেছি। সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যেও এই ধরণের এলেমেলো হতে দেখা যায়। সেইজন্য বলা হয়, মন স্থির না থাকলে জপধ্যানটা একটু কম কর, আগে মনটাকে স্থির কর, তারপর জপধ্যান কর। সাধনা কখনই এলোমেলো ভাবে হয় না, সাধনা সুব্যবস্থিত ভাবে হয়।

ঠাকুর আবার গান ধরিলেনঃ

গান –নদে টলমল টলমল করে –গৌরাঙ্গের হিল্লোলে রে। বৈষ্ণব পরম্পরার এগুলো সব নামকরা প্রচলিত গান।

সংকীর্তনতরঙ্গ রাঘবমন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সেখানে পরিক্রমণ ও নৃত্য করিয়া ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহের সম্মুখে প্রণাম করিয়া, গঙ্গাকুলের বাবুদের প্রতিষ্ঠিত শ্রশ্রীরাধাকৃষ্ণের বাড়ির দিকে এই তরঙ্গায়িত জনসঙ্ঘ অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বাড়িতে সংকীর্তন দলের কিয়দংশ প্রবেশ করিতেছে –অধিকাংশ লোকই প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। কেবল দ্বারদেশে ঠেলাঠেলি করিয়া উঁকি মারিতেছে।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধকৃষ্ণের আঙিনায় আবার নৃত্য করিতেছেন। কীর্তানন্দে গরগর মাতোয়ারা। মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতেছেন। আপনারাও যদি এই রকম ভক্তি নিয়ে সংকীর্তন করেন, আপনাদের মনটাও কিছুক্ষণের জন্য একটা ভাবাবস্থায় চলে যাবে। কিন্তু সমস্যা হল, এখান থেকে ঠাকুরের মন চলে যেত সমাধিতে, আমাদের মন সমাধিতে যাবে না। ওই অবস্থায় ইমোশানলিজম্ হয়ে যায় আর সেখান থেকে সব কিছু যখন শেষ হয়ে যাবে, মনটাও ধপাস্ করে পড়ে যাবে। সেইজন্য জ্ঞানচর্চা যদি না থাকে, সাধুসঙ্গ যদি করা না থাকে সব এলোমেলো হয়ে যাবে। **আর চতুর্দিক হইতে পুষ্প ও বাতাসা চরণতলে পড়িতেছে। হরিনামের রোল আঙিনার ভিতর মুহুর্মুহুঃ হইতেছে। সেই ধ্বণি রাজপথে পৌঁছিয়া সহস্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল**। আগেকার দিনে লোকেরা খুব ধর্মপ্রাণ ছিলেন, যখনই 'হরিবোল' ধ্বণি শুনতেন সবাই সমবেত কণ্ঠে 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বণি দিতেন। যাঁরা ভক্ত ছিলেন, তাঁদের বংশধররা সবাই বাবু হয়ে গেছেন, বাবু হয়ে কি করে 'হরিবোল' বলবেন, লজ্জার কথা। কিন্তু এখানে অন্য রকম। কি রকম? মাস্টারমশাইয়ের খুব সুন্দর বর্ণনা।

ভাগীরথীবক্ষে যে-সকল নৌকা যাতায়াত করিতেছিল তাহাদের আরোহিগণ অবাক্ হইয়া এই সমুদ্রকল্লোলের ন্যায় হরিধ্বনি শুনিতে লাগিল ও নিজেরাও 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতে লাগিল। পরিবেশটাই এমন হয়ে যায় যে, যাদের ইচ্ছে নেই তারাও ওর মধ্যে অংশগ্রহণ করবে, তাদের যেন একটা শক্তি ওর মধ্যে টেনে নামিয়ে আনছে।

পেনেটীর মহোৎসবের সমবেত সহস্র সহস্র নরনারী ভাবিতেছে, এই মহাপুরুষের ভিতর নিশ্চয়ই শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছে। দুই-একজন ভাবিতেছে ইনিই বা সাক্ষাৎ সেই শ্রীগৌরাঙ্গ। আজ আমরা বলছি ঠাকুর অবতার, আগেকার দিনে লোকেরা তো ওই ভাবে দেখতেন না, ওই ভাবও ছিল না।

ক্ষুদ্র আঙিনায় বহুলোক একত্রিত হইয়াছে। ভক্তেরা অতি সন্তর্পণে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বাহিরে আনিলেন। ঠাকুরের তখন কোন হুঁশ নেই কিনা। আগেকার দিনে একটা বড় ঘোমটা দিয়ে যখন পুত্রবধূ শ্বশুর বাড়ি আসত, সেই সময় নববধূকে বাড়ির সব মহিলারা অতি সন্তর্পণে অন্দরমহলে নিয়ে যেতেন, বড় ঘোমটার জন্য পরিষ্কার করে কিছু দেখতে পেত না কিনা। ঠাকুরের এখানে দেখা কি, দেখা-শোনা সবই বন্ধ; ভক্তরা যদি না তাঁকে সামলান তো কোথায় পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙবেন, মাথা ভাঙবেন, কারুর কিছু করার থাকবে না।

ঠাকুরকে এবার শ্রীযুক্ত মণি সেনের বৈঠকখানায় নিয়ে আসা হয়েছে, সেখানে ঠাকুর উপবেশন করলেন। **এই সেন পরিবারদেরই পেনেটীতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা। তাঁহারাই এখন বর্ষে বর্ষে মহোৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন ও ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করেন**। কথামৃতে আমরা অনেকগুলো 'মণি' নাম পাই।

এখন কীর্তন থেমেছে, ঠাকুরও আগের অবস্থা থেকে অনেক স্বাভাবিক হয়েছেন। **ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিলে পর মণি সেন ও তাঁহাদের গুরুদেব নবদ্বীপ গোস্বামী ঠাকুরকে কক্ষান্তরে লইয়া গিয়া প্রসাদ আনিয়া সেবা করাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাম, রাখাল, মাস্টার, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তদেরও আর-একঘরে বসান হইল। ঠাকুর ভক্তবৎসল –নিজে দাঁড়াইয়া আনন্দ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে খাওয়াইতেছেন**।

কিছুক্ষণ আগে যিনি 'তারা তারা দুভাই এসেছে রে' কীর্তন করতে করতে নৃত্য করছিলেন; ভ্রমর যেমন মধুপান করে মত্ত হয়ে যায়, ঠাকুরও তেমন হরিরসপানে মত্ত হয়ে গিয়েছিলেন; তিনিই এখন নিজের ভক্তদের আনন্দ করে খাওয়াচ্ছেন। ঠাকুর নিজেই বলতেন –এর ভিতর দুই আছে, এক তিনি আর তাঁর ভক্ত। ঠাকুরের যাঁরা ভক্ত, এনাদের প্রতি ঠাকুরের বিশেষ দৃষ্টি, বিশেষ কৃপা। ঠিক তেমনি যখন ঈশ্বরীয় কথা, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে যাচ্ছেন, তখন অন্য রকম হয়ে যাচ্ছেন। আমরা এই প্রসঙ্গ এখানে শেষ করছি, এরপরে মণি সেনের বৈঠকখানায় বসে ঠাকুর নবদ্বীপ গোস্বামীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবেন, খুব সুন্দর আলাপ ও আলোচনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ গোস্বামীর প্রতি উপদেশ

এই অধ্যায়টা খুব সুন্দর আর সবার জন্য অনেগুলো খুব দরকারী কথা বলা হয়েছে। মণি সেনের গুরু ছিলেন শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ গোস্বামী। সংকীর্তন করে এসে সবাই এখন মণি সেনের বাড়িতে বসেছেন। সবার প্রসাদ পাওয়া হয়েছে। **নবদ্বীপ গোস্বামী প্রসাদ পাওয়ার পর ঠাণ্ডা হইয়া বৈঠকখানায় আসিয়া ঠাকুরের কাছে বসিলেন**। নবদ্বীপ গোস্বামীর এই জিনিসটা আমার খুব ভাল লাগে, অন্যান্যদের যেমন ঠাকুরকে নিয়ে একটা কৌতুহল, নবদ্বীপ গোস্বামীর ঠাকুরকে নিয়ে ঠিক কৌতুহল নেই, কিন্তু সম্মান আছে। তখনকার দিনে যাঁরা ঠাকুরকে সম্মান করতেন, কেমন যে অবাক লাগে এই ভেবে যে,

কোথাও তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে ঠাকুর এক অলৌকিক দিব্য পুরুষ। এখানে মাঝে কিছু কথা আছে যেগুলো খুব ছোট ছোট কথা, কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ।

মণি সেন ঠাকুরের গাড়িভাড়া দিতে চাইছেন। ঠাকুর তখন বৈঠকখানায় একটা কৌচে বাসে আছেন, কৌচে বসেই বললেন, রাম প্রভৃতিরা গাড়িভাড়া কেন নেবে, ওরা সবাই রোজগার করে। আমাদের দেশের একটা প্রথা যে, বাড়িতে কেউ এলে বাড়ির কর্তাকে তার গাড়িভাড়াটা দিতে হয়। এটা আমাদের খুব পুরনো সংস্কৃতি। কিন্তু এখানে একটু অন্য ব্যাপার, অনেকে মিলে উৎসবে গেছেন আর রাম প্রভৃতিরা রোজগার করে, ওদের গাড়িভাড়া কেন দেওয়া। আমাদের প্রাচীন প্রথা হল, বাড়ির যিনি সবার বড়, গাড়িভাড়াটা তাঁর হাত দিয়ে দেওয়া হয়।

এইবার ঠাকুর নবদ্বীপ গোস্বামীর সহিত ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নবদ্বীপের প্রতি) –ভক্তি পাকলে ভাব –তারপর মহাভাব –তারপর প্রেম –তারপর বস্তুলাভ(ঈশ্বরলাভ)।

কথামৃতে ঠাকুর ভক্তি নিয়ে অনেকবার অনেক কিছু বলেছেন। আমরাও যেমন যেমন সুযোগ পেয়েছি আলোচনা করেছি। শ্রোতাদের মধ্যে আমি একটা চঞ্চলতার ভাব লক্ষ্য করি, কারণ থেকে থেকে প্রশ্ন করেন; মহারাজ এটা কি, সেটা কি। বোঝা যায় নূতন শ্রোতা। ধৈর্য ধরে একটু শুনতে হয়। জ্ঞান অর্জন করা মানে, আপনাকে একটু খাটতে হবে। মোসায়েবের মত বলবে, মহাশয়, আমাকে সমাধিটুকু শিখিয়ে দিন; এভাবে হয় না। আমাদের কিছু লেকচার শুনুন, তারপর দেখবেন নিজেরই ভাল লাগতে শুরু হবে। সেখান থেকে আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকবেন। এই যে ঠাকুর নবদ্বীপ গোস্বামীকে চারটে শব্দ বলছেন –ভক্তি, ভাব, মহাভাব ও প্রেম; এই চারটে শব্দ ঠাকুর বৈষ্ণবদের পরম্পরা থেকে বলছেন। এরপরে যেটা বলতে যাব, তার আগে খুব সুন্দর একটা উদাহরণ আমার মনে এলো, আপনাদেরও হয়ত শুনে ভাল লাগবে।

একজন যে সাধারণ সন্ত মহাত্মা তিনি যখন উচ্চমানের গ্রন্থ রচনা করেন, যেমন তুলসীদাস রচনা করলেন রামচরিতমানস। অন্য দিকে বেদ, উপনিষদ ঋষিদের বাক্য দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে; ঠাকুরও ঋষি। বেদের সময় অবতারের ধারণা স্পষ্ট হয়নি, তাঁরা তাই অবতার জানতেনও না, মানতেনও না, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই ঋষি। ঋষি, সন্ত, কবি এনাদের সবার কথায় একটু তফাৎ আছে। একজন কবি, একজন সন্ত কবি, আর-একজন ঋষি, তিনজনেরই বাক্য পরিবেশানায় একটু তফাৎ থাকবে। একটা ঘটনা বলি, তাহলে ভাল বুঝতে পারবেন। অনেক বছর আগে আমি মথুরা, বৃন্দাবন গিয়েছিলাম। কাছেই তাজমহল, একটা যোগাযোগ হয়ে যেতে দেখতে চলে গিয়েছিলাম। ছোটবেলা থেকে তাজমহলের কথা পড়েছি, শুনেছি। গাইড না নিয়ে নিজেই আমি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। এখনও আমার অনেকগুলো দৃশ্যের কথা মনে আছে। যেটাই দেখছি মুখ দিয়ে একটাই শব্দ বেরিয়ে আসছে, বাঃ কি সুন্দর। হঠাৎ দেখলাম একজন ট্যুরিস্ট সঙ্গে গাইড। গাইড তাকে দেখাচ্ছে, 'এই যে সাদা মারবেল পাথর দেখছেন, এর বৈশিষ্ট্য দেখুন'। বলে, উনি টর্চ জ্বালালেন। আলোটা মারবেলের উপর ফেললেন, আলো ফেলতেই ভিতরের মারবেলটা পুরো জ্বলে উঠল। এটা যেন মারবেল না, কাঁচ। ট্যুরিস্টরা পছন্দ করে না তার গাইডের পাশে থেকে অন্য কেউ সব কিছু ফোকটিয়া দেখবে। আমিও ভদ্রতার খাতিরে সরে এলাম। তখনই আমার মনে হল, যে ট্যুরিস্ট অবাক হয়ে দেখছে, সে যখন অন্যদের বর্ণনা করবে তখন অন্য রকম হবে, গাইড যখন বর্ণনা করবে তখন আর-এক রকম। একই জিনিসের বর্ণনা, কিন্তু দুটো বর্ণনাতে তফাৎ হয়ে যাবে।

কবি যখন কোন কিছু রচনা করেন তখন এখান-ওখান থেকে কিছু পড়ে বা শুনে নিজের একটা কল্পনা লাগিয়ে রচনা করেন। সন্ত মহাত্মারা যখন লেখেন, তখন ট্যুরিস্টের বর্ণনা করার মত, অবাক

করে দেওয়ার মত, সত্যিই কি সাংঘাতিক জিনিস তাই না! ঋষিরা যখন বলেন, তাঁরা সত্যিই কি সাংঘাতিক জিনিস বলবেন? না, বলবেন না; ওনাদের বলার মধ্যে কোন উচ্ছাস থাকে না। আজকেই আমার এক খুব পড়াশোনা করা সন্ন্যাসী ভাইয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। একটা কি আলোচনা হতে গিয়ে সন্ন্যাসী ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠাকুর ঈশ্বরকে নিয়ে এত কথা বলেছেন, সাধনা নিয়ে কত কথা বলেছেন, কিন্তু কোথাও কি ঈশ্বররূপের বর্ণনা করেছেন'? আমি বললাম, না। উনি বলছেন, 'যেমন বিভিন্ন জায়গায় আমরা পাই কালী এই রকম, কৃষ্ণ এই রকম, রাম এই রকম; ঠাকুর কোথাও বলছেন না যে, কালী এই রকম, কৃষ্ণ এই রকম। শুধু দু-এক জায়গায় একবার-দুবার বলছেন, ঈশ্বরের রূপের কাছে রম্ভা, মেনকা, তিলোত্তমাকে চিতার ভস্ম বলে মনে হয়। ঠাকুরের কোন বর্ণনায়, কোন কথায় ইমোশান নেই। ভক্তিতে যেখানে দেখবেন ইমোশানাল ভাব আছে, বুঝবেন এটা গাইডের না, ট্যুরিস্টের বর্ণনা। ট্যুরিস্টের বর্ণনার মধ্যে যে ভুল কিছু আছে তা না, কিন্তু গাইড গাইড; ছোট্ট থেকে ছোট্ট জিনিসকে জানে।

ঠাকুর যে কথা এখানে বলছেন, এটাকেই আমরা খুব সহজ কথায় প্রেমাভক্তি বলি, শুদ্ধাভক্তির কথা বলি। কিন্তু এই যে –ভক্তি, ভাব, মহাভাব ও প্রেম এবং বস্তুলাভ; এই কটির মধ্যে খুব সূক্ষ্ম সুক্ষ্ম তফাৎ আছে, যেটাকে ধরা বা বোঝা খুব মুশকিল এবং অপরকে বোঝানাটাও খুব কঠিন। কুণ্ডলিনীর ব্যাপারটা তাও বোঝান যায়, কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়ে সুষুম্নার মধ্য দিয়ে উঠে হৃদ্দেশে আসছে, এটা এক রকম। যেমন যেমন উপরে উঠতে থাকে তখন আর-এক রকম। কিন্তু শেষ অবস্থায় গিয়ে ঠিক মেলে না। যাঁরা যোগী বা যাঁরা জ্ঞানপথে যান, তাঁদেরও কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়। সেইজন্য কার কুণ্ডলিনী কতটা জাগ্রত হয়েছে বোঝার জন্য অন্য একটা সহজ উপায় আছে। সেটা হল, কার মন কত ভিতরে গেছে। কি করে বুঝব কার মন গভীরে গেছে? একটা সমুদ্র, একজন সমুদ্রের গভীরে নেমে গেছেন। তাঁর কোন যন্ত্র নেই, কিছু নেই, আপনি কি করে জানবেন সে কত গভীরে গেছে? ভক্তিতে কে কত গভীরে গেছে বোঝা খুব মুশকিল। কিন্তু সেই ভক্তির গভীর থেকে মন যখন বেরিয়ে আসবে, তখন তার আচরণ দেখলে মোটামুটি বোঝা যায় যে এনার ক্ষেত্রে এটা ভক্তি না ভাব। এখন এই যে আমিত্ব, আপনি যখন ভক্তি থেকে সংসারে ফেরৎ আসছেন, সংসারে ফেরৎ আসা মানে হল আমিত্ব ফিরে আসা। আমিত্ব তো খারাপ কিছু না, আমিত্বই তো সবাইকে চালাচ্ছে। এই আমিত্ব, যেটা মন, এটা কেমন থাকছে, কোথায় কতটা থাকছে; তাতে বোঝা যায় এটা তার ভক্তি না ভাব।

এখানে কিন্তু ঠাকুর প্রেমা ভক্তির কথা বলছেন, যেটাকে এখানে ঠাকুর প্রেম বলছেন, নারদীয় ভক্তিসূত্রে এই ভক্তিকে পরিভাষিত করছেন –*সা তস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা*। কিন্তু ঠাকুর যে প্রথম শব্দে ভক্তি বলছেন, এই ভক্তি হল ভক্তির প্রথম ধাপ। এর উঁচু ধাপ হল যেটা ঠাকুর ভাব বলছেন। মহাভাব আরও উঁচু ধাপ, মহাভাবের থেকে প্রেম আরও উঁচু ধাপ। যাঁরা ভক্তি করেন, আমার মত লোক, আপনাদের মধ্যে জানি না কে কোন স্তরে আছেন, কিন্তু অনেকেই আছেন বলতে পারি। ওই ভক্তি থেকে আমাদের মন যখন বেরিয়ে আসে তখন সংসার আমাদের মধ্যে পুরোদমে চলে আসে, যে সংসারের সাথে আমাদের মন এক হয়ে আছে। সেই কাম, সেই ক্রোধ, সেই লোভ, সেই তর্কবিতর্ক, সেই আমিত্ব, সব কিছু ফিরে আসে। যে মনটাকে নিয়ে ভক্তিতে চলে গিয়েছিল, ওই মনটা আসলে সংসারেরই মন কিন্তু মাঝে মাঝে মনটা ঈশ্বরে ঢুকে পড়ছে। বেশির ভাগ ভক্তই এখনও এই ভক্তিতেই আছে। এগুলো কোন খারাপ অর্থে বলা হচ্ছে না, কিন্তু এটাই ভক্তির প্রথম সোপান, নিম্নতম ধাপ।

সেখান থেকে যদি সত্যিকারের সাধনা করা হয়, সত্যিই যদি ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা জন্মায়; আসলে ঈশ্বরকে ভালবাসা অত সহজ না, প্রচুর খাটতে হয়। কত ভক্তদের সাথে দেখা হয়, এখানে দেখা করতে আসেন, ক্লাশে আসেন, উৎসবাদিতে দেখা হয়, কদাচিৎ কাউকে আমি দেখেছি যিনি ইমোশানালিজমে নেই। কি করে বুঝবেন? ঠাকুর আগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা বলতে গিয়ে চুনোপুটি বেরিয়ে আসার কথা বলছিলেন। একটু টোকা দিতেই চুনোপুটি সব বেরোতে শুরু হয়ে যায়।

কিন্তু যাঁরা ঠিক ঠিক ভক্ত, ঠিক ঠিক ভক্তি নিয়ে আছেন, তিনি বলবেন, ঠাকুর, আমি তোমাকেই চাই, তোমাকে ছাড়া আমার অন্য কোন কিছু লাগবে না। এটাকে নিয়ে যদি সাধনা করেন, সকাল, দুপুর, বিকাল ও রাত; আবার সকাল আর দুপুরের মাঝখানে, দুপুর আর সন্ধ্যের মাঝখানে আবার; এই সাধনা যত বাড়বে, তখন ধীরে ধীরে কি হবে? সংসারকে যে আমরা এত গুরুত্ব দিই, সংসারের যে এত বন্ধন আমাদের উপরে; এগুলো অনেক কমে যাবে। বলতে পারেন প্রায় খসে যাবে।

একটা জিনিস যেটা লোকেরা বোঝেন না, বুঝতে চান না; যখনই সংসার বলছি, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাথায় এসে যাচ্ছে যেখানে আমি আছি তার আশেপাশে যা কিছু আছে, এটাই যেন সংসার। কলকাতা শহর, বাংলা, ভারত, আমেরিকা, ইউরোপ, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, গ্যালাক্সি, সমস্ত মিলিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এটাই সংসার। কিন্তু এটাই কি সংসার? একেবারেই না। আপনারা যাঁরা শুনছেন, আপনারা নিষ্ঠাবান, এখানে কোন খোশগপ্প নেই, এই ক্লাশ তাঁরাই শুনবেন যাঁদের একটু সিরিয়াসনেস আছে; আপনারা এটা ভাল করে বুঝে নিন, এই যে বাইরে যে সংসার এটা কিছু না।

পুরো সংসারটা হচ্ছে চিত্তবৃত্তি, মনে বৃত্তিগুলো উঠছে, মনে যে চিন্তা-ভাবনাগুলো উঠছে, এটাই সংসার, এর বাইরে সংসার নেই। অতি সাধারণ একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে; আমি চশমা পরে আছি, আপনাদের মধ্যে অনেকেই চশমা পরে আছেন। যাঁরা ফিজিক্সের অল্প একটুও জানেন, তাঁরা জানবেন যে এই কলমটাকে আমি যে দেখছি, এই কলমকে আমি বস্তুরূপে দেখছি। কিন্তু ফিজিক্স যাঁরা জানেন, তাঁরা জানবেন, আসলে এই যে কলম, চশমার জন্য একটা ছায়া হয়ে যাচ্ছে, একটা ইমেজ তৈরী হচ্ছে। তার মানে, চশমা খুলে আমি যখন দেখছি তখন বস্তুকে দেখছি; চশমা পরে যখন দেখছি তখন আমি বস্তুকে দেখি না, আমি দেখছি বস্তুর ছবি। শ্রীশ্রীমা বলছেন, ছায়া-কায়া সমান, সংসারেও ছায়া-কায়া সমান। আর-একটু ভিতরে যদি যান, পুরো চোখটাও একটা লেন্স, পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আমরা ওই লেন্স দিয়েই দেখছি। আসলে আমরা যা কিছু জানি, যা কিছু দেখি, সবটাই ছবি মাত্র। মন এই তফাৎ করতে পারে না। আপনি বস্তুকে দেখছেন, নাকি বস্তুর ছবিকে দেখছেন, মন তফাৎ করতে পারে না। আপনি হয়ত এমন জায়গায় থাকেন সেখানে প্রতিবেশীরা প্রচুর আওয়াজ করে, প্রথমের দিকে বিরক্তিকর লাগে। পরে ধীরে ধীরে শব্দ শুনতে শুনতে মন সয়ে যায়। তারপর নিজের কাজকর্ম যখন করছেন, কিছুক্ষণের জন্য সেই আওয়াজ যেন থাকে না। আওয়াজ তো সব সময় ছিল, কিন্তু আপনার মন কোন একটা কিছুতে এমন কেন্দ্রিত হয়ে গেছে যে ওই আওয়াজ আপনি আর বুঝতে পারছেন না।

ঠিক তেমনি এই মন যখন ঈশ্বরে কেন্দ্রিত হয়ে যায়, তখন চারপাশের এই যে সংসার, এই সংসার আর মনে কোন চিত্তবৃত্তি সৃষ্টি করতে পারেনা। ফলে কি হয়, সংসার জিনিসটাকে তখন সত্যিকারের ছায়ার মত মনে হয়। জীবনে যখন আমরা প্রচুর দুঃখ, আঘাত, কষ্ট পাই তখন বলি সবই মিথ্যা, আপন কেউ না, ভালবাসা বলে কিছু নাই, সবটাই স্বার্থ ইত্যাদি। এই কথাগুলো নিশ্চয় আমি, আপনি, আমরা সবাই জীবনে অনেকবার নিজেরা বলেছি এবং বলতে শুনেছি। কিন্তু মন যখন কেন্দ্রিত হয়ে যায় তখন ত্যাগ অভাবে হয় না, স্বভাবে হয়। আপনি অনেক মার হয়ত খেয়েছেন, সেইজন্য মনে হচ্ছে সংসার অসার। আমাকে কেউ যদি এসে বলে সংসার অসার; আমি বুঝে যাই যে বেচারী জীবনে প্রচুর মার খেয়েছে। কিন্তু যিনি ঈশ্বরকে ভালবেসে সংসার থেকে সরে এসেছেন, তাঁরা সংসারকে কখন অসার বলেন না; তাঁদের কাছে সংসার সংসারের মত আছে। যখন সংসারে কাউকে ভোগ করতে দেখছেন তখন তাকে এটাই বলতে হয়, হ্যাঁ ভাই ভোগ করে যাও, ঠিকই আছে।

দেওঘর বিদ্যাপীঠে আমি অনেক বছর ছিলাম, ওখানকার ক্যাম্পাস এত বড় আর ভ্যারাইটিস এত বেশি যে ওখানে অনেক বৈচিত্রপূর্ণ ঘটনার আমি সাক্ষী ছিলাম। শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ প্রথমে ওখানকার প্রিন্সিপাল ছিলেন, পরে সেক্রেটারি হয়েছিলেন। এই ঘটনা যখন হয়েছিল তখন তিনি ওখানকার প্রিন্সিপাল ছিলেন। পরে সেক্রেটারি হয়েও তিনি এই রকমই করতেন। দেওঘর ক্যাম্পাসে

একটা বড় আমবাগান আছে। মহারাজ ভোরবেলা ওখানে হাঁটতেন, পুরো ক্যাম্পাসটাই হাঁটতেন। আমের সিজিনে কোথায় কোথায় গাছ থেকে আম পড়েছে দেখতেন, দেখতে পেলে আমগুলোকে উনি তুলে নিতেন। আমরাও হাঁটছি মহারাজের সঙ্গে, আমাদের আমের উপর চোখ পড়ত না, কিন্তু ওই ঘাসের মধ্যে ওনার ঠিক চোখ পড়ত। আমগুলিকে তুলে এনে তিনি নিজের অফিসে রাখতেন। গরমের ছুটি পড়ে গেলে ছেলেরা সব বাড়ি চলে যেত। উনি আমকে জলে ভিজিয়ে কেটে রেখে দিতেন। আমি তখন ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারীরা ওনার কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে যেতেন। সেই সময় উনি আমাদের ওই গাছপাকা আম দিতেন। উনি নিজে কিন্তু আম খেতেন না, অন্তত আমি কোন দিন ওনাকে আম খেতে দেখিনি। নিজে খেতেন না, কিন্তু খাওয়াতে ভালবাসতেন।

ব্রহ্মচারীরা অল্প বয়সের, সংসারের সব রকম ভোগ-বাসনা ছেড়ে সাধু হতে এসেছেন। আশ্রমে ভোগ করার মত কোন কিছু নেই। খাওয়ার মধ্যে তো ভাত-ডাল-চচ্চড়ি, কি একটা গাছপাকা আম গাছ থেকে পড়েছে, সেটাকে কুড়িয়ে এনে মহারাজ কেটে তাঁদের খেতে দিচ্ছেন, এটাই innocent joys of life। আমাদের সাধু-সন্ন্যাসীদের বাইরে যাওয়ার অনেক ঝামেলা আছে। প্রথম ঝামেলা সেন্টার থেকে ছাড়তে চায় না, বাইরে যেতে হলে টাকা-পয়সা লাগে, আমাদের কোন ইনকাম নেই কোথায় টাকা-পয়সা পাব। তীর্থে গেলে বড়দের কাছে আমাদের চাইতে হয়। বড়রা এখন চলে গেছেন, চাওয়াও মুশকিল। সেটাকে নিয়ে একজন মহারাজ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজকে নালিশের সুরে বলছেন, সাধুরা তীর্থে যাচ্ছে, সব ঘুরতে যাচ্ছে, আশ্রমের কাজকর্ম কে সামলাবে, ইত্যাদি। মহারাজ তখন খুব সুন্দর কথা বললেন, 'সাধুদের জীবনে তো আর কোন আনন্দ নেই, এটা একটা innocent joy, এটাকে কেন আটকাতে চাইছ'।

ঠিক তেমনি যাঁরা ভক্তিতে অনেক গভীরে চলে গেছেন, আমরা বলি ঠিক আছে, এদের দরকার এখন। সবাই মুক্তির দিকে এগোচ্ছে। যার জ্বালা-যন্ত্রণা একটু বেশি, যে একেবারে জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবে, তাকে দুটো কথা বলতে পার ঠিক আছে। সবটাই তো খেলনা, কোনটা খেলনা না? ঠাকুরের যে পূজা-অর্চনা এটাও তো খেলনা। ঠাকুরের যে উৎসব করা হচ্ছে এটাও তো খেলনা। যেখানে শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই, সেখানে ঠাকুরের পূজা-অর্চনা খেলনা ছাড়া কি। বাচ্চারা একটা খেলনা নিয়ে থাকে, যুবকরা অন্য খেলনা নিয়ে থাকে, বৃদ্ধরা আর-একটা খেলনা নিয়ে থাকে, নাতিপোতা তার খেলনা, ওটাই নিয়ে থাকতে ভালবাসে। ভক্তদেরও খেলনা চাই, আজকে ঠাকুরের উৎসব, কাল মায়ের উৎসব; সব একই জিনিস তফাৎ কিছু নেই। হ্যাঁ, ভক্তদের খেলনা মনটাকে উচ্চ জায়গায় নিয়ে যায়। সেখান থেকে মানুষ অন্তে একত্বের দিকে যাবে।

ভক্তির পর যে ভাব হয়, যখন তিনি ঈশ্বরের ভাবে ঢুকলেন তখন সংসারের বন্ধনটা আস্তে আস্তে আলগা হয়ে যায়। তখন তাঁর কাছে সংসার হল —সংসার যার জন্য আছে তার জন্যই থাক, তোমরা ওই নিয়েই আনন্দ কর, আমার আর লাগবে না। কম বয়সে আমরা দেখেছি, বড় মহারাজরা যাঁরা তখন ছিলেন, তাঁরা ঠিক এই ধরণের কথাই আমাদের বলতেন, 'তোমরা আনন্দ কর, এখন তোমাদের আনন্দ করারই বয়স, কিন্তু আমি আর ওতে নেই'। ঠিক ঠিক ভক্ত ঠিক এই রকম হয়ে যান।

মহাভাব হওয়া মানে, আরও গভীরে চলে যাওয়া, তখন শুধু আমির রেখাটুকু থেকে যায়। আর পুরো সংসারটা যেন একটা ছায়ার মত দেখে, তখন মনে হয়, হ্যাঁ সংসার বলে কিছু একটা ছিল বা আছে। মহাভাব থেকে প্রেম যখন আসে, তখন ওই ছায়া-ছায়া ভাবটাও চলে যাচ্ছে। এখন শুধু তুমি আর আমি, এই ভাব। ঠাকুর এই যে ভক্তি, ভাব, মহাভাব ও প্রেম বলছেন, তার মানে আপনার আমি কতটুকু থাকছে। শুধু ভক্তিতে আমরা কি বুঝব তার ভিতরে কি চলছে। চোখ বুঝে ধ্যান করছে সেটা বকের ধ্যান, নাকি সমাধিস্থ পুরুষের ধ্যান, আমরা কি করে বুঝব। বোঝা যায়, যখন ওখান থেকে নেমে আসছেন। সেইজন্য যাঁরা জপধ্যান করেন তাঁদের বারবার বলা হয়, শাস্ত্র নিয়ে থাকবে। জপধ্যান তো

বেশিক্ষণ করা যাবে না, দিনে খুব জোর দুই থেকে চার ঘন্টা, আবার এও শুনছি যে আমাদের শ্রোতাদের অনেকে নাকি আট ঘন্টা দশ ঘন্টা করে জপধ্যান করেন। কিন্তু সেখান থেকেও তাকে বেরোতে হবে, তখন কি করবেন? শাস্ত্র নিয়ে থাকতে হবে। জপধ্যান আর পাঠ। সংসার থেকে সরাসরি ধ্যানে নামা যায় না। শাস্ত্র পাঠ করতে হয়, সেখান থেকে জপ, জপ থেকে ধ্যানে নামতে হয়। যখন নামে তখন ঠিক সেই ভাবেই নামতে হয়, ধ্যান থেকে জপ, জপ থেকে শাস্ত্র পাঠ, সেখান থেকে সংসার। যাঁরা ঈশ্বরের ভাবে ডুবে গেছেন, তাঁদের পক্ষে সংসার করা যাবে না, সম্ভব না। সেইজন্য আলাদা হয়ে যেতে হয়, ঠিক আছে তুমি তোমার মত থাক। এই পুরো জিনিসটাকে যদি বুঝে নেন, তাহলে ঠাকুর এবার যে জিনিসগুলোকে নিয়ে বলবেন, সেগুলো বুঝতে সুবিধা হবে।

গৌরাঙ্গের –মহাভব, প্রেম।

এই যে ভাষা আমরা বলছি, ঠাকুর ভক্তি, ভাব কবেই অতিক্রম করে গেছেন; তাঁর শুধু মহাভাব আর প্রেম; ভাবও না, মহাভাব, প্রেম।

এই প্রেম হলে জগৎ তো ভুল হয়ে যাবেই। আবার নিজের দেহ যে এত প্রিয় তাও ভুল হয়ে যায়। মা যেমন সন্তানকে ভালবাসে, সন্তানের কিসে ভাল হবে, কিসে সন্তানের মন্দ হতে পারে, এই ভেবে ভেবে মা নিজের শরীরের দিকে তাকায় না, শরীরের কথা ভুলে যায়, নিজের শরীরের সুখ-সুবিধা আর দেখে না। কিন্তু এখানে বলছেন, মন ঈশ্বরে এমন ডুবে আছে যে, নিজের দেহ যে এত প্রিয় সেটাও ভুল হয়ে যায়। আমাদের ভিতর 'আমি' ভাব এত প্রবল যে, এই জিনিসগুলোকে ধারণা করা একেবারেই অসম্ভব। রাসলীলার বর্ণনা করার সময় সব সময় বলি, জীবনে যদি কাউকে এমন ভালবেসে থাকেন, যেখানে 'আমি' ভুলে গেছেন, তবে গিয়ে এই জিনিসগুলো যদি একটু বুঝতে পারেন। গোপীরা এই যে বলছেন, তোমার খুশির জন্য আমি সব কিছু করব, এই ভাব যদি কখন আসে তবে এই জিনিসটা বুঝতে পারবেন। তা নাহলে করা তো অনেক দূরের কথা, বুঝতেই পারবেন না। বলছেন, **গৌরাঙ্গের এই প্রেম হয়েছিল। সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল**।

জীবের মহাভাব বা প্রেম হয় না –তাদের ভাব পর্যন্ত। এখানে জীব বলতে, আমি, আপনি না। আমরা যদি ডুব দিই, কি হবে বলা খুব মুশকিল। কারণ এগুলো হচ্ছে যাঁরা ভক্তিশাস্ত্রের প্রণেতা তাঁরা এই রকম শ্রেনী করে দেন –এরা হল জীব, এনারা ঈশ্বরকোটি, এটা নিত্যসিদ্ধ, এটা ওই ইত্যাদি। বেদান্তে এগুলো কিছু নেই, বেদান্তে সব এক, সব শুদ্ধ আত্মা। এখন সাধারণ মানুষ, সাধারণ জীব ওই স্তরে যেতে পারবে কিনা? কোন দিন যেতে পারবে না। কারণ সাধারণ জীবের পরিভাষাই হল, 'আমি' ভাব যার প্রবল। কিন্তু তার 'আমি' যদি চলে যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই নেওয়া যেতে পারে; তিনি কামারপুকুরে বড় হয়েছেন, সেখান থেকে পরে যখন তিনি এই অবস্থায় পৌঁছালেন তখন কামারপুকুরের লোকেরাই বলতেন, আমরা তো জানতাম আমাদের গদাইএর ভিতর কি একটা আছে, একদিন সে বিরাট কিছু হবে। আপনি যদি জীবনে বিরাট কিছু সাফল্য পান, লোকেরা তখন বলবে –ওর ভিতর বিশেষ কিছু ছিল। যদি জীবনে সফল না হন, তখন বলবে, ও চিরদিন এই রকমই ছিল। সাধারণ মানুষের এসব কথাগুলোকে নেওয়া যায় না।

ভেবে দেখুন, ঠাকুর যখন কামারপুকুরে আছেন, দক্ষিণেশ্বরে আছেন, লোকেরা তাঁকে একজন সাধারণ পূজারী হিসাবেই দেখত। আজকে আমরা জানছি ঠাকুর অবতার। আপনি হয়ত সিদ্ধ হননি, কিন্তু আপনি যে একজন নিত্যসিদ্ধ নন এর তো কোন প্রমাণ নেই। এর কোন প্রমাণ নেই যে আপনি ঈশ্বরকোটি নন। চেষ্টা করলে তখন বোঝা যায়, আপনার মহাভাব হয় কিনা, আপনার প্রেম হয় কিনা; তারপর আমরা জানতে পারব আপনি ঈশ্বরকোটি কিনা। আগে আপনি ধরেই নিন যে, আপনি একজন ঈশ্বরকোটি, এরপরে সাধনা করুন। বৈষ্ণবদের এই যে সব কিছুকে শ্রেনীবদ্ধ করা, আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা মানি না, আমি তো একেবারেই মানি না। আমি ঘোর থেকে ঘোরতম বেদান্তী,

বেদান্তী এই অর্থে সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত শক্তি, সমস্ত বুদ্ধি তোমার ভিতরে, এটা থেকে আমি কক্ষণ সরে আসব না। তাহলে আমি আর অবতার কি এক? প্রশ্নই নেই। কারণ যেমনি আপনি অবতার শব্দটা নিয়ে আসছেন, তখনই সংসার সত্য হয়ে যাচ্ছে। সংসার যখন সত্য হয়ে যাচ্ছে, তখন আমি আর অবতার কোন দিন এক হতে পারব না; শক্তির তফাৎ হয়ে যাবে। কিন্তু তত্ত্বের দিকে এক। সিংহ আর সিংহ শাবক এক। আপনি মেনে চলুন আপনি নিত্যসিদ্ধ, আপনি মেনে চলুন আমি ঈশ্বরকোটি, নিজেকে জীব কেন মনে করবেন। ঠাকুরই বলছেন, যে শালা নিজেকে পাপী মনে করে সেই পাপী। আপনি তাই কেন মনে করবেন যে আপনি জীব? আপনি নিত্যসিদ্ধ, আপনি ঈশ্বরকোটি। এবার সাধনা করুন, যাতে আপনারও মহাভাব হয়, প্রেম হয়। কে বলেছে আপনাকে যে আপনি জীব, ঠাকুর কি বলে দিয়েছেন, তুই জীব। কিন্তু আমাদের নিজস্ব ধর্ম হল কুঁড়েমির ধর্ম; ভাব, মহাভাব, প্রেম এগুলোর জন্য যে পরিমাণ খাটতে হবে, সেই খাটনি করতে আপনি প্রস্তুত? তখন আপনি 'থাক আমার লাগবে না' বলে পাশ ফিরে শুয়ে নাক ডাকতে শুরু করলেন। জীবের তো এর থেকে বেশি হয় না, ঠাকুরই বলে দিয়ে গেছেন। ধাপ্পাবাজদের ধর্ম সব। আরে আগে করেই দেখুন না কত দূর যেতে পারছেন।

ঠাকুর বলছেন, **জীবের মহাভাব বা প্রেম হয় না –তাদের ভাব পর্যন্ত। আর গৌরঙ্গের তিনটি অবস্থা হত। কেমন?**

নবদ্বীপ –আজ্ঞা হাঁ। অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা আর বাহ্যদশা। আমরা আগে অনেকবার এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ –অন্তর্দশায় তিনি সমাধিস্থ থাকতেন। অর্ধবাহ্যদশায় কেবল নৃত্য করতে পারতেন। বাহ্যদশায় নামসংকীর্তন করতেন। এগুলোকে আমাদের inspiration হিসাবে নিতে হয়। আমি ওখান পর্যন্ত হয়ত নাও পৌঁছাতে পারি, কিন্তু চেষ্টা তো চালিয়ে যেতে হবে। পরীক্ষার আগে আপনি একশতে একশ নম্বর পাওয়ার চেষ্টা করে যদি নিজেকে তৈরী করা শুরু করেন, হয়ত নব্বইতে গিয়ে ঠেকবেন। কিন্তু প্রথমেই যদি পঞ্চাশের উপরে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেন, তাহলে নম্বর কোথায় গিয়ে ঠেকবে? ভগবানই জানেন।

নবদ্বীপ তাঁহার ছেলেটিকে আনিয়া ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন। ছেলেটি যুবা পুরুষ –শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। কথামৃত যখন আমি একটু একটু বুঝতে শুরু করলাম, আমার এই জায়গাটা তখন খুব সুন্দর লেগেছিল। কতটা সম্মান করলে মানুষ নিজের সন্তানকে কারুর কাছে নিয়ে আসে। নিজের সন্তানকে কারুর সামনে এগিয়ে দেওয়া মানে, আপনাকে একজন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি রূপে সম্মান করি। কোন বাবা যখন নিজের মেয়েকে বিবাহের জন্য কোন পরিবারে দেয়, সেটা হল শ্রেষ্ঠতম সম্মান –আমার কন্যাকে আপনাদের কাছে দিলাম। পরিচয় করানোর জন্যও যদি আনা হয়, বিরাট সম্মান।

নবদ্বীপ –ঘরে শাস্ত্র পড়ে। এ-দেশে বেদ একরকম পাওয়াই যেত না। মোক্ষমূলার ছাপালেন, তাই তবু লোকে পড়ছে।

ম্যাক্সমূলারকে সবাই মোক্ষমূলার বলতেন। তখনকার দিনে বেদের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যেত, কিন্তু খুব কম। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাথে ঝামেলা হওয়াতে ১৮৫৭ সালের পরে ওনারা খুব তড়িঘরি করে বেদের পাণ্ডুলিপিকে জমা করে বেদ ছাপিয়ে বার করলেন। ফলে বেদ এখন যে কেউ সংগ্রহ করে পড়তে পারে, কিন্তু বেদের অর্থ বোঝা খুব কঠিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –বেশি শাস্ত্র পড়াতে আরও হানি হয়।

আমাদের ভক্তরা ঠাকুরের এই কথা নিয়ে গরু মারা বিদ্যার মত আমাদের এমন বিরক্ত করে, কিছু বলার নেই। ঠাকুর এখানে এই কথা দিয়ে দুটি জিনিস বলছেন। একটা হল শাস্ত্রের দিকে চলে যাওয়া, আর-একটা হল ঈশ্বরের দিকে চলে যাওয়া। শাস্ত্রের নিজস্ব একটা রস আছে। ওই রসে মজে গেলে ঈশ্বরের রস অধরা থেকে যাবে। ঠাকুর আবার অন্য জায়গায় বলছেন –একটা দিকে বেশি এগিয়ে গেলে ঈশ্বরের দিকে মন যায় না। আমাদের সাধুদের দেখেছি, যাঁরা বিজ্ঞানচর্চা, লেকচার দেওয়া, এগুলোর দিকে বেশি চলে গেছেন, ওনারা ওটাকে নিয়েই থাকেন। যাঁরা শাস্ত্রকে নিয়ে পড়ে থাকছেন, এবং খণ্ডন-মণ্ডন এগুলোতে বেশি নামছেন, তাঁদেরও ওই সমস্যাটা হয়ে যায়। কিন্তু যাঁরা শাস্ত্রের অর্থকে নিয়ে রমণ করেন, *বেদান্ত বাক্যেষু সদা রমন্তঃ,* বেদান্ত বাক্যে সব সময় রমণ করছেন, তাঁদের শাস্ত্রের অর্থের ধারণাটা অন্যান্যদের তুলনায় অনেক ভাল হয়। ঠাকুর এখানে নবদ্বীপ গোস্বামী এই একটা কথা বলছেন বটে, কারণ কম বয়সে পাণ্ডিত্যের দিকে যাওয়ার একটা ঝোঁক থাকে। কিন্তু আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, এমনিতে শাস্ত্র যদি না পড়া হয়, ধারণা করার অভ্যাসটা হয় না। মনে করছি এখান থেকে সেখান থেকে দু চারটে কথা শুনে নিলে শাস্ত্রের কথা বুঝে ফেলব, না এভাবে হয় না। অন্য দিকে শাস্ত্র অধ্যয়নকে যদি সাধনা রূপে নেওয়া হয়, জীবনকে পরিষ্কার করে দেবে। তাই শাস্ত্র অধ্যয়ন খুব জরুরী।

শাস্ত্রের সার জেনে নিতে হয়। তারপর আর গ্রন্থের কি দরকার! ঠাকুর এই কথা বলছেন ভক্তির স্ট্যাণ্ডপয়েন্ট থেকে, যার কাছে ভক্তিই সব কিছু, তার জন্য এই কথা বলছেন। কিন্তু আমি, আপনি সাধারণ মানুষ। যদি ঠিক ঠিক ধ্যান করতে পারেন, তাহলে জপ করতে হয় না। ঠিক ঠিক জপ যদি করতে পারেন, তাহলে এত শাস্ত্র পড়তে হয় না। যদি জপধ্যান এগুলো দিনে দশ-বারো ঘন্টা না করতে পারেন, তাহলে শাস্ত্রের আবৃত্তি করতে হয়। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে সারা বছর ধরে অনেকগুলো কোর্স হতেই থাকে। বছর শেষ হতে না হতেই দৌড়ে দৌড়ে এসে আমাদের বলতে থাকে, মহারাজ এই বছর এই কোর্সটা করে নিয়েছি, এবার কোন কোর্সে ভর্তি হব? যে কোর্সই করুন, আপনার কাছে সবটাই সমান, কারণ আপনি কোনটাই বুঝতে পারবেন না। ওই মনে মনে ভাববেন, আমি এটাও করেছি, সেটাও করেছি। দিল্লিতে বড়লোকদের পরিবারের মেয়েরা, মহিলারা সব রকম করবে, আর বলবে, হাঁ জী ম্যায়নে তো রেইকী ভী কি, জী ম্যায়নে আর্ট অফ লিভিং ভী কি। এটাও করেছে, সেটাও করেছে, কিন্তু মনের যে নানা রকম আবর্জনা জমে আছে সেগুলো পরিষ্কার হচ্ছে না। আগে মনের আবর্জনাগুলো সাফ করুন, এটা সেটা করলে সাফ হয় না।

সারটুকু জেনে ডুব মারতে হয় –ঈশ্বরলাভের জন্য।

আমায় মা জানিয়ে দিয়েছেন, বেদান্তের সার –ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। গীতার সার –দশবার গীতা বললে যা হয়, অর্থাৎ, 'ত্যাগী, ত্যাগী'।

ঠাকুরের এই কথাগুলো অত্যন্ত উচ্চমানের কথা, এগুলো আমাদের জন্য নয়। আপনারা জেনে থাকবেন, ঠাকুর নরেনকে কিভাবে বিভিন্ন শাস্ত্র পড়তে বলতেন। নরেন ঠাকুরকে একবার বলছিলেন, মহাশয় আপনি কি জানেন? আপনি তো কিছু পড়েননি। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, আমি শুনেছি কত। এগুলো কি হয়, কথামৃত নিজে পড়ে মানুষ এক রকম ভেবে বলে –শাস্ত্র পড়ার কি দরকার, এই তো দেখুন ঠাকুর কি বলছে, শাস্ত্র পড়ার কি দরকার, ঠাকুরই সত্য। থাকুন না আপনি শাস্ত্র না পড়ে, কে আপনকে কি বলবে; তাতেই যদি শান্তিতে আছেন মনে করেন, ভাল, তাই থাকুন। কিন্তু একটু ভেবে বলুন তো আপনার এই শান্তিটা শ্মশানের শান্তি নয় তো? কারণ ঠিক ঠিক যদি শান্তি হয়ে থাকে, তাহলে যখন ঝড়-ঝাপ্টা আসবে তখনও আপনি শান্ত থাকবেন; তার থেকেও বেশি আপনার কাছে পাঁচজন লোক গেলে তাঁরাও শান্তি পাবে।

আপনার কাছে গেলে আরও পাঁচজন কি শান্তি পায়? যদি না পায়, তাহলে আপনার শান্তিতে কিছু গোলমাল আছে। আপনার কাছে গেলে পাঁচজন কি কিছু শিখতে পারে? যদি না শিখতে পারে, তাহলে আপনার জ্ঞানে কিছু সমস্যা আছে। আপনার কাছে পাঁচজন গেলে কি ধর্মের দিকে এগিয়ে যেতে উৎসাহ পায়? তাহলে আপনার ধর্মটা ঠিক, না হলে ভুল। যার কাছে টাকা-পয়সা আছে, অন্য দিকে দানীধ্যানী, লোকজন তার কাছে চাইতে গেলে দুটো টাকা পায়। আপনার যে সম্পদ আছে, লোকেরা আপনার কাছে গেলে সেও কিছু পাবে। আতরের দোকানে বসে থাকলে এমনিতেই শরীরে আতরের গন্ধ লেগে যাবে। পেট্রল পাম্পে গেলে পেট্রলের গন্ধ পাবে। পরিষ্কার বোঝা যায় আপনার ভিতরে কি আছে। আর সেটা থেকে বলে দেওয়া যায়, এরপরে আপনার কি হবে। ওই সব ধারণা, ঠাকুর আসবেন নিয়ে যাবেন। কোথায় নিয়ে যাবেন, সবই তো ঠাকুরের, পেট্রল পাম্পটাও ঠাকুরের, আতরের দোকানটাও ঠাকুরের। দেখুন তিনি আপনাকে কোথা গিয়ে রাখেন।

নবদ্বীপ –'ত্যাগী' ঠিক হয় না, 'তাগী' হয়। তাহলেও সেই মানে। তগ্ ধাতু ঘঞ্=তাগ; তার উত্তর ইন্ প্রত্যয় –তাগী। 'ত্যাগী' মানেও যা 'তাগী' মানেও তাই। তবে এটা বলা খুব মুশকিল, যাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণ জানেন তাঁদের সঙ্গে অনেকবার অনেকেরই আলোচনা হয়েছিল, ওনারা বলেন নবদ্বীপ গোস্বামীর এই ব্যাখ্যাটা ঠিক না। আছে কোন ব্যাকরণের নিয়ম, যাই হোক, কেন ঠিক না, ওনারা উত্তর দিতে পারলেন না। তবে এগুলোর মধ্যে মন ঢুকে গেলে আমাদের মনটাকে অন্য দিকে নিয়ে চলে যাবে। ঠাকুর এখানে গীতার সার বলতে চাইছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –গীতার সার মানে –হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে পাবার জন্য সাধন কর। গীতাতেও একই কথা শেষে বলছেন *–সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। ঠাকুরের এই কথা শুনে মনে হবে, বুঝে গেছি ঠাকুর কি বলতে চাইছেন। কিন্তু বুঝে গেছিতে থেমে যাওয়া না। এখানে বুঝে গেছি মানে, এবার আমার জীবনটাকেও পুরোপুরি সেই রকম করে নেওয়া। ঠাকুর যে বলছেন, গীতার এই সার, বেদান্তের এই সার; অর্থ হল, যেমনি তিনি সার বুঝে নিলেন, তিনি সেটাতে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছেন। দুজনের মধ্যে ভালবাসা, হঠাৎ ঝগড়া হয়ে গেল। তখন বলবে, তোমাকে আমি বুঝে গেছি, তুমি এই রকমই; আমার মনকে কষ্ট দেওয়ার জন্যই তুমি এসেছ। সরে আসছেন না কেন? আপনি বলছেন ঠিকই, বুঝেওছেন ঠিক; কিন্তু আপনার ইচ্ছাশক্তি এতই দুর্বল যে আপনি ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না। তার মানে আপনি সে-রকম নন। ঠাকুর যখন বলছেন গীতার সার এই, তার মানে তিনি সেখানে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের ভক্তরাও বলেন, হ্যাঁ মহারাজ বুঝে গেছি? আপনার আচরণ কি সে-রকম হয়ে গেছে? যদি না, তাহলে আপনার শাস্ত্রে মন দেওয়া দরকার।

নবদ্বীপ –ত্যাগ করবার মন কই হচ্ছে? এই হল তফাৎ। আমরা আগে ট্যুরিস্ট আর গাইডের যে আলোচনা করলাম, এখানে সেই ট্যুরিস্ট আর গাইডের তফাৎ। নবদ্বীপ গোস্বামী একজন সাধক, তিনি এসব কথা সবই জানেন, বোঝেন; কিন্তু বলছেন, ত্যাগ করবার মন কই হচ্ছে? আমাদের সবারই এই সমস্যা। এত শাস্ত্র পড়ে, এত সাধুসঙ্গ করেও আমরা ত্যাগের দিকে যেতে পারছি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ –তোমরা গোস্বামী, তোমাদের ঠাকুর সেবা আছে –তোমাদের সংসার ত্যাগ করলে চলবে না। তাহলে ঠাকুর সেবা কে করবে? তোমরা মনে ত্যাগ করবে।

কথামৃত পড়ে আমাদের আধ-খ্যাচড়া জ্ঞান হলে যা হয়, এসে বলবে, মহারাজ সংসার ত্যাগ করতে চাই। সংসার ত্যাগ করে যাবেন কোথায়? আমরা সাধুরা যে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে আছি, এটাও একটা সংসার। আমাদের এখানে সব রকমের সব কিছুই হচ্ছে, একে সংসার ছাড়া আর কি বলা যাবে। তবে হ্যাঁ, সংসারে যেমন সব কিছু আপন বলে মনে হয়, এখানে তা হয় না; কম বয়সে মনে হত, এখন আর মনে হয় না। আমাদের একজন মহারাজকে এক জায়গায় ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়েছে। সেই মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী, উনি তখন সহ সম্পাদক, ওনার কাছে এসে খুব দুঃখ করে বলছেন, 'দেখুন

মহারাজ আমার সঙ্গে এই রকম করল'। উনি সব শুনলেন। ওই মহারাজ যখন ভাবছেন, এবার কিছু একটা সুরাহা করে দেবেন, তখন স্বামী সুহিতানন্দজী বলছেন, 'বুঝলি, এই রকম দু-চারবার হয়ে গেলে বুঝে নিবি সজ্ঘটা এই রকমই, তখন আর মন খারাপ হবে না'। সত্যিই তাই, যত মন দিয়ে কাজ করুন, যাই করুন, কিছুই কিছু না। মালিক যখন বের করে দেবে আম কাঠের সিন্দুকটাও নিয়ে যাবার জো নেই। তখন আপনা থেকেই বৈরাগ্য এসে যায়।

তিনিই লোকশিক্ষার জন্য তোমাদের সংসারে রেখেছেন –তুমি হাজার মনে কর, ত্যাগ করতে পারবে না –তিনি এমন প্রকৃতি তোমায় দিয়েছেন যে, তোমায় সংসারের কাজই করতে হবে।

লোকেদের এই কথা বলে বলে আমরা থকে যাই। সবাই বলে যাচ্ছে ত্যাগ কর, ত্যাগ না করলে কিছু হবে না, ইত্যাদি। কিন্তু ত্যাগ আর হয় না। নিজের প্রকৃতিকে বিচার করতে হয়। যার ত্যাগের প্রকৃতি সে কখন মুখে বলে না, মহারাজ বলবেন, কি করে সংসার ত্যাগ হবে? যদি বলছেন, তার মানে আপনার দ্বারা ত্যাগ হবে না। আপনার এটা প্রকৃতি নয়, প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাবেন না। এই যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, *প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি*, তুমি যুদ্ধ করবে না কি বলছ, তুমি ইচ্ছা করলেই যুদ্ধ করা থেকে নিবৃত্ত হতে পারবে না, তোমার প্রকৃতিতেই যুদ্ধ করার প্রবৃত্তি রয়েছে। গীতাতে এই প্রকৃতিকে নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলছেন, মানুষের যেটা প্রকৃতি, সেই অনুসারে কাজ করলে কোন দোষ হয় না, কোন পাপ লাগে না। এটাকে আধার করেই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্ণাশ্রমের ভালমন্দ কি আছে, তার বিচার এখানে করা হচ্ছে না।

বর্ণাশ্রমের উদ্দেশ্য ছিল, তুমি যে কাজ করছ এটা তোমার যে স্বাভাবিক প্রকৃতি, সেই অনুসারে করছ। এই কাজটাই যদি তুমি নিষ্কাম ভাবে কর, যদি পূজা রূপে কর; এতেই তোমার পরমপ্রাপ্তি হবে। আপনার ভিতরে যদি সত্যিই ত্যাগের ভাব থাকত, সিদ্ধিলাভ করার জন্য আপনাকে তো কোথাও জন্ম নিতে হবে। কিন্তু যেমনি চোখটা ফুটে যাবে, পূর্বজন্মের ওই ত্যাগের ভাবেই আপনি ঠিক বেরিয়ে যাবেন, কেউ আটকাতে পারবে না। মা-বাবা যদি বেঁধে ধরে নিয়ে যায়, আমার ক্ষেত্রে এটাই হয়েছিল, আমাকে সত্যিকারের বেঁধে ধরে আশ্রম থেকে নিয়ে গেল। তাতেও আমি ঠিক কায়দা করে মাঝরাতে ট্রেন থেকে নেমে পাল্টে অন্য ট্রেন ধরে পালিয়ে এলাম। যদি আপনার মধ্যে ত্যাগের প্রবৃত্তি থাকে, ঠাকুর এমন একটা পরিস্থিতি করে দেবেন যে, আপনি বেরিয়ে আসবেনই আসবেন।

যদি না বেরিয়ে আসেন, তার মানে আপনার প্রকৃতি, এই যে ঠাকুর বলছেন, তোমাদের ঠাকুর সেবা আছে, তার মানে দায়ীত্ব আছে। উদ্দেশ্যটা কি? প্রথম উদ্দেশ্য হল আত্মজ্ঞান, মুক্তিলাভ। আচ্ছা ওটা না হয় অনেক উঁচু কথা, ওর নীচে? একটা মুক্তির নিঃশ্বাস, স্বাধীন ভাব। জীবনে আমি দুটো জিনিসকেই ভালবেসেছি, এক সাধুসঙ্গ, আর এক সাধু। আমার যত ভালবাসা সাধু কেন্দ্রিক, যত ঝগড়াঝাটি সেখানেও শুধু সাধু, সাধু ছাড়া আমার জীবনে আর কিছু নেই, এটাই সাধুসঙ্গ। আর এই সাধুসঙ্গ এমন একটা নিষ্কাম ভাবে হয় যে, মনে হয় স্বাভাবিক ভাবে আমি যেন মুক্তির নিঃশ্বাস নিচ্ছি, দমবন্ধ হয় না। সংসারে থাকলে, এই মুক্তির নিঃশ্বাস নেওয়া খুব কঠিন। কিন্তু উপায় কি আছে? ঠাকুর বলছেন, গোবরের পোকাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখলে হেঁদিয়ে হেঁদিয়ে মরে যাবে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে, পারে না থাকতে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যেতে নেই। এই যে ভক্তি, শাস্ত্র, প্রকৃতি, সব কিছুকে মিলিয়ে ঠাকুর কেমন সুন্দর একই কথা বলছেন। কিন্তু সবটাই হল ঈশ্বরলাভের দিকে এগিয়ে দেওয়া।

ঠাকুর নবদ্বীপ গোস্বামীকে সংসারে থাকা নিয়ে বলছিলেন। তিনি অর্থাৎ ঈশ্বর তোমাদের সংসারে রেখেছেন লোকশিক্ষার জন্য। লোকশিক্ষার জন্য ভগবান অনেককে অনেক ভাবে রাখেন। তিনি কাউকে সুখে রাখেন, কাউকে কষ্টে রাখেন, কাউকে সন্ন্যাসী করেন আবার কাউকে গৃহস্থ করেন। আপনাদেরও ঠাকুর সংসারে রেখেছেন, আপনাদের কাজ আপনার আশেপাশের লোকেদের ঈশ্বরের দুটি কথা বলা। লোকেদের সহজে ঈশ্বরে মন যেতে চায় না, বাচ্চারা কি সহজে পড়তে বসতে চায়? মাকে কত কষ্ট

করে, কত কায়দা করে বাচ্চাদের পড়তে বসাতে হয়। প্রথমে বেলুড় মঠে প্রসাদ খাওয়াতে নিয়ে আসতে হয়, সেখান থেকে উৎসবাদিতে নিয়ে আসা, সেখান থেকে ধীরে ধীরে মহারাজদের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রবচনগুলিতে নিয়ে আসা। অপরকে ঈশ্বরের দিকে আনার জন্য খাটতে হয়। শুধু আমারটুকু হলেই হল, এই ভাবনাতে হয় না।

এরপর ঠাকুর বলছেন, কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, তুমি যুদ্ধ করবে না কি বলছ, তোমার প্রকৃতিই তোমাকে দিয়ে যুদ্ধ করাবে। এগুলো আমরা আগে ব্যাখ্যা করেছি। তার মানে সংসারে কাজ করতে হয়। আপনি যদি বলেন আমি কাজ করব না, আপনার প্রবৃত্তিই আপনাকে দিয়ে কাজ করাবে। আপনার প্রকৃতিই আপনাকে টেনে নিয়ে গিয়ে কাজ করাবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন, এই কথা বলতে বলতেই ঠাকুর সমাধিস্থ। মাস্টারমশাই খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সহিত কথা কহিতেছেন –এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর আবার সমাধিস্থ হইতেছেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত স্থির –চক্ষু পলকশূন্য। নিঃশ্বাস বহিতেছে কি না বহিতেছে বুঝা যায় না। নবদ্বীপ গোস্বামী, তাঁহার পুত্র ও ভক্তগণ অবাক হইয়া দেখিতেছেন।

এর আগে আমরা খুব সুন্দর বর্ণনা দেখেছি, কিভাবে ঠাকুর তীরবেগে দৌড়ে কীর্তনীয়াদের দলে ঢুকে ''তারা তারা দুভাই এসেছে রে'' গান করছেন, গান ও নৃত্য করতে করতে সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছেন। এই ধরণের গানে ক্ষণিক কুণ্ডলীনি জাগে, ক্ষণিক একটু ভাবের উদয় হয়। ওই মুহূর্তে ঈশ্বরে মন পুরো ডুবে যায়, সংসারে মন থাকে না। যেমন খুব জোর আগুন জ্বললে তার মধ্যে কাঁচা কাঠ ফেলে দিলেও জ্বলে যাবে। কিন্তু একটুতে জ্বলে ওঠার জন্য কর্পুর হতে হবে, দেশলাই কাঠি মারলেই জ্বলে উঠবে। এখানে ঠাকুর নিজে থেকেই কথা বলছেন। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কি বলেছেন, সেটা বলতে বলতে ঠাকুরের মন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনের সেই তখনকার দৃশ্যের মধ্যে ঢুকে গেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আদপে অর্জুনকে কি বলেছেন, না বলেছেন, কিছু বলেও ছিলেন কিনা আমরা জানিনা, কিন্তু ওই যে ভাব, সেই ভাবের মধ্যে ঠাকুর সম্পূর্ণ রূপে ঢুকে যাচ্ছেন। এর আগে ঠাকুর বলেছিলেন, তোমরা গোপীদের বিশ্বাস নাও করতে পার, কিন্তু ওদের টানটুকু নাও। ওই টান যেটা ওটাই ধর্ম, ওই ভাবটুকু নিতে হয়।

ঠাকুর সমাধিস্থ। সত্যিই, ঠাকুর যদি গান শুনে সমাধিস্থ হতেন, তাহলে কোথাও একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন থেকে যেত। কিন্তু ঈশ্বরীয় কথা, তা যেভাবেই আসুক, ঠাকুর নিজে থেকেই বলুন বা অন্য কেউ বললেও তিনি সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছেন।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ঠাকুর নবদ্বীপকে বলিতেছেনঃ

যোগ ভোগ। তোমরা গোস্বামীবংশ তোমাদের দুই-ই আছে। এখানে যোগ বলতে ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জুড়ে থাকা। এটা কিন্তু যোগের শেষ কথা নয়। ঠাকুরের নিত্যসেবা আছে, শাস্ত্র অধ্যয়ন আছে, লোকেদের ঈশ্বরীয় কথা, শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে শোনাতে ও বোঝাতে হবে; আর এই কাজগুলো কিন্তু সংসারে থেকে করতে হবে।

এখন কেবল তাঁকে প্রার্থনা কর, আন্তরিক প্রার্থনা –'হে ঈশ্বর, তোমার এই ভুবনমোহিনী মায়ার ঐশ্বর্য –আমি চাই না –আমি তোমায় চাই'।

এই যে বলছেন, 'আমি তোমায় চাই'; পুরো কথামৃতের মূল কি যদি বলতে হয়, তাহলে এটাই –আমি তোমায় চাই; তোমার ভুবনমোহিনী মায়ার ঐশ্বর্য আমি চাই না, মায়ার ঐশ্বর্য মানেই সংসার। হ্যাঁ ঠিক আছে সংসার আছে, সংসারেরও দরকার আছে, সংসার যে মিথ্যা তা না। তবে ঈশ্বর যেরূপ সত্য সংসার সেরূপ সত্য নয়। আর সংসারের সুখ আমাদের এত বেশি ভাল লাগে যে, আমরা ওতেই মজে

যাই। এমনকি সুখ যখন অনেক বেশি হয়ে যায়, তখন দুঃখের সিনেমা দেখতে যাই, দুঃখের নাটক দেখতে যাই; যাতে আরও বেশি আমরা সুখ ভোগ করতে পারি। এটাই হল ভুবনমোহিনী মায়া। আমি, আপনি, আমরা সবাই এমনটাই মজে যাই।

এই সংসার তো তাঁরই মায়া, আর মায়া বলতে খারাপ কিছু না, এটা ঠাকুরেরই ঐশ্বর্য। কিন্তু একই খাটনিতে যদি আপনি একটা সাধারণ চাকরি পান আর তার সাথে সাথে একটা ভাল চাকরি যদি পান, আপনি অবশ্যই ভাল চাকরিটাই নেবেন। একই পয়সা দিয়ে বাসি আনাজ আর টাটকা আনাজ পেলে কোন আনাজটা নেবেন? আমাদের জীবনে যে খাটনি, এই খাটনি দিয়ে আমরা সংসারের যে সুখ পাচ্ছি, এর থেকে অনেক কম খাটনিতে ঈশ্বরের যে পরমসুখ, যেখানে দুই বলে আর কিছু থেকে যায় না, যেখানে দুঃখ বলে কিছু থাকে না, সুখ বলে কিছু থাকে না, সমস্ত কিছুর পারের যে আনন্দ, ওই আনন্দকে প্রাপ্ত করা যায়। ওই আনন্দ প্রাপ্তির দিকে কেন আমাদের যাওয়ার ইচ্ছা হয় না? কারণ, সংসারে আমরা এত মজে রয়েছি, এতদিনের অভ্যাস ছেড়ে এদিকে আসতে মন চায় না।

সেইজন্য যখনই ঠাকুরের কাছে যাবেন, আপনার ঘরে যেখানে ঠাকুরের ছবি আছে, যে ছবিতে নিত্যপূজা করেন, কিংবা রামকৃষ্ণ মিশনের কোন কেন্দ্রে বা মন্দিরে যান বা যদি বেলুড় মঠেই আসেন, আপনার মনে পাঁচ রকম চাহিদা থাকতে পারে, ঠাকুরকে বলুন, আমার এটা দরকার, সেটা দরকার। কিন্তু তার সাথে এটাও বলা দরকার –*অনিত্যমসুখং লোকং ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্*। যখনই আমার সন্ন্যাসী ভাইদের সঙ্গে দেখা হয়, কিংবা বাইরের সেই রকম বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়, তাঁদের বলি, দেখুন আমিও জীবনে অনেক জ্বলেছি পুড়েছি, অনেক মার খেয়েছি, এটাও বুঝেছি এখান থেকে বাঁচার নিস্তার নেই। *অনিত্যমসুখং লোকং*, বুঝে নাও জগৎটা এই রকমই, *ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্*, বুঝে নিয়ে আমারই ভজনা কর। দুঃখটাও তাঁর ঐশ্বর্য; বিনাশ, এটাও তাঁর ঐশ্বর্য; ভালটাও তাঁর ঐশ্বর্য; সবটাই তাঁর ঐশ্বর্য। কিন্তু এসবে আর না, আমি শুধু তোমায় চাই। যিনি কারণ জগতের ঈশ্বর, যিনি মহাকারণ, যিনি শুদ্ধ আত্মা বা যিনি শুদ্ধ ঈশ্বররূপে আছেন, *তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিদীব চক্ষুরাততম্*, এই যে *পরমং পদম্* বিষ্ণুপদ, বিষ্ণুলোক, বিষ্ণুলোকও যা ভগবান বিষ্ণুও তাই, ওখানে যেন যেতে পারি।

আপনারা আমার কথা মানুন, কাগজে লিখে নিন, ছয় মাস টানা রোজ ঠাকুরের ছবির সামনে বা মন্দিরাদিতে গিয়ে মেকানিক্যালি, কোন বিশ্বাস না করে, শ্রদ্ধা ভক্তি না রেখে সকাল সন্ধ্যা এই প্রার্থনা করুন –ঠাকুর যেটা বলছেন, আমি তোমায় চাই। ফিক্ করে হাসুন, কারণ আপনি ভিতর ভিতর চাইছেন না। আমাদের একটা সেন্টারে ছেলেরা সন্ধ্যেবেলা আরতির সময় গান করত, খণ্ডন ভব বন্ধন। প্রথমের দিকে ছেলেরা খণ্ডন ভব বন্ধন বলত না। ওরাই বলে দিত, প্রথম লাইনটা বলিস না। কেন? আমরা তো চাই না ভববন্ধন খণ্ডন হোক। বাকি লাইনগুলির অর্থ বোঝে না বলে খুব করে গান করে যাচ্ছে। আপনি মুখের কথাই বলে যান –আমি তোমায় চাই; ছয় মাস পরে দেখুন আপনার কি হয়। একটু শ্রদ্ধা ভক্তি জুড়ে যদি বলতে পারেন আরও ভাল, আর পুরো শ্রদ্ধা ভক্তি সহ যদি বলতে পারেন, তাহলে তো আর কোন কথাই নেই। ছয় মাস টানা মুখের কথাই বলে যান, দেখবেন ছয় মাস থেকে আপনার জঞ্জাল কমতে শুরু হয়ে গেছে। আপনি কপট ভক্তি করুন, ধাপ্পার ভক্তি করুন, কিন্তু করুন; দেখুন কি হয়।

এই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্*, বেদ যাদের নিষেধ করে দিয়েছে; আসলে বেদ করেনি, ব্রাহ্মণরাই নিষেধ করে বলছে, এদের দ্বারা কোন দিন হবে না। হে অর্জুন ভাল করে জেনে রাখ, ঈশ্বরের নাম যেই করুক, যাকে ম্লেচ্ছ বলা হয়, যাকে চণ্ডাল বলা হয়; যে ঈশ্বরের নাম করবে, ওহি পরমপদ পায়েওগা। কিন্তু আপনি অন্যদের থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ, আপনার ভিতরে ভক্তি অনেক আগে থেকেই আছে; শুধু এই প্রার্থনা –আমি তোমায় চাই। মাত্র ছয়টি

মাস সকাল সন্ধ্যা টানা এই প্রার্থনা করা। আপনি করুন দেখুন কি হয়। জীবন যদি পাল্টে না যায়, এখানে এসে আমাকে দুটো গালাগাল দিয়ে যাবেন।

ঠাকুর আবার বলছেন, **তিনি তো সর্বভূতেই আছেন –তবে ভক্ত কাকে বলে?** কথামৃত না হলে শাস্ত্র আমরা কিছুই বুঝতে পারতাম না। ভাগবত আদি গ্রন্থ, উপনিষদ কিছুই বুঝতে পারতাম না। ভক্ত কাকে বলে? **যে তাঁতে থাকে –যার মন-প্রাণ-অন্তরাত্মা সব, তাঁতে গত হয়েছে**।

বক্তব্য হল, নারায়ণই সব কিছু হয়েছেন। কিন্তু হাতি নারায়ণও আছে, বাঘ নারায়ণও আছে, মাহুত নারায়ণও আছে, দুষ্ট নারায়ণও আছে, লোচ্চারূপী নারায়ণও আছে, মিথ্যাবাদীরূপী নারায়ণও আছে; নারায়ণের কত রূপ। একবার আমার এক পরিচিত বলছেন, 'আপনারা এত সব বলেন, কিন্তু আমি তো জানি লোকটা কি পরিমাণ ধাপ্পাবাজ, আর এই ধাপ্পাবাজকেই কিনা বলছেন ধাপ্পাবাজরূপী নারায়ণ'? ধাপ্পাবাজরূপী নারায়ণ বলাতে সমস্যা কোথায়? সমস্যা হচ্ছে এখানে, আমাদের মন আগে থেকেই ঠিক করে নিয়েছে ভগবান মানে সব সময় ভাল হবেন। তা না, সবটাই ভগবান, সতীরূপে তিনি সেই ভগবতী। মথুরবাবু ঠাকুরের কাছে নাচগান করা একটি মেয়েকে পাঠিয়েছেন। ঠাকুর সেই মেয়েটিকে দেখে হাতজোড় করে প্রার্থনা করতে লাগলেন। কি প্রার্থনা করেছিলেন আমরা জানি না। আমরা যদি ধরে নিই, তিনি প্রার্থনা করেছিলেন –*ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারাস্বরাত্মিকা*, আপনি একটু কল্পনা করে দেখুন তো সেই মেয়েটির কি অবস্থা হয়েছিল। ইদানিং কালে যাদের অমুক ওয়ার্কার, তমুক ওয়ার্কার বলা হয়, তাদের কাছে ঠাকুরকে নিয়ে গেছে, কি জন্য নিয়ে গেছে? এনার ব্রহ্মচর্য আছে বলে যত সমস্যা, ব্রহ্মচর্য ভাঙাতে হবে। কত আয়োজন, কিন্তু বড় বড় চোখওয়ালা মেয়েদের দেখে ঠাকুর হাঁটু গেড়ে হাতজোড় করে প্রার্থনা করতে লাগলেন, ওই মেয়েগুলোর এখন কি দুরবস্থা ভেবে দেখুন।

স্বামীজীর জাহাজ কায়রো বন্দরে থেমেছিল। দলবল নিয়ে স্বামীজী কায়রো শহর দেখতে গিয়ে ওই রকম মেয়েদের সামনে পড়ে গেলেন। মেয়েগুলো নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করছে, আওয়াজ দিচ্ছে। একটা গ্রুপ, তারা এই রকম বেশি করছিল, তাদের দিকে স্বামীজী এগিয়ে গেলেন, আর তাদের সামনে গিয়ে কাঁদছেন আর বলছেন –দেখ, কিভাবে এরা এদের দিব্য ভাবকে শরীরে নামিয়ে দিয়েছে, আজকে এদের দুরবস্থটা দেখ। ওরা সবাই মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগল, স্বামীজীর জামা ছুঁয়ে বলছেন, Man of God। এই জিনিস যে ঠাকুরই করেছিলেন তা না, আত্মজ্ঞানী পুরুষরা সবাই করেন। দেখছেন সাক্ষাৎ নারায়ণ, কিন্তু নিজের দিব্য ভাবকে কোথায় লাগিয়ে দিয়েছে। একবার ভেবে দেখুন, আপনারা আপনাদের দিব্য ভাবকে কোথায় লাগিয়ে দিয়েছেন? ওই একটা ছোট্ট সংসারে যেখানে তিনজন, চারজন আছেন; ওই সংসারে। থেকে থেকে আমাদের কাছে এসে কাঁদছেন, মহারাজ সংসার আর ভাল লাগে না। তারপর যেই কাল একটা কিছু ভাল হয়ে গেল, আবার ওতে মজে গেলেন। আবার কিছু দিন পর এসে বলবে, সংসার আর ভাল লাগে না।

নারায়ণ সবারই ভিতর, সব কিছু নারায়ণেরই রূপ। কিন্তু বাইরের যে রূপ, যা পুরোদমে স্বরূপের দিকে যাচ্ছে। ঠাকুর বলছেন, যার মন-প্রাণ-অন্তরাত্মা সব তাঁতে গত হয়েছে, ইনি হলেন ভক্ত। এই স্বরূপ আর রূপ যখন মিশে এক হয়ে যায়, তিনি হয়ে যান মুক্ত পুরুষ।

ঠাকুর এইবার সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখনও ঠাকুর যে কথাগুলো বলে যাচ্ছেন, এখনও সব কিছু নিয়ন্ত্রণে নেই, সবে সমাধিস্থ থেকে সহজ অবস্থায় আসছেন। **নবদ্বীপকে বলিতেছেনঃ**

আমার এই যে অবস্থাটা হয় (সমাধি অবস্থা) কেউ কেউ বলে রোগ। আমি বলি যাঁর চৈতন্যে জগৎ চৈতন্য হয়ে রয়েছে –তাঁর চিন্তা করে কেউ কি অচৈতন্য হয়? জগতে যা কিছু চৈতন্য, এটা আত্মার চৈতন্য। যিনি সেই আত্মার চিন্তন করছেন, সে কি কখন অচৈতন্য হতে পারেন?

যে যাঁর চিন্তা করে তার মন সেটাতে রোমে থাকে, সেই রঙে রোঙে থাকে। সামারসেট মঙ্ক খুব বিখ্যাত ইংরাজী লেখক, তাঁর একটা বইএর নাম ‘The Razor’s Edege’, সেখানে একটা জায়গায় তিনি বর্ণনা করছেন, একজন খুব ভাল মানুষ বিভিন্ন কারণে তাঁকে কোন মেয়ে ভালবাসে। কিন্তু লোকটি চাইছে তাকে কোন ভাবে তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হোক। তখন একজনকে দায়ীত্ব দেওয়া হল তুমি এই কাজটা কর। এবার যাকে দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে, সে অনেক কিছু কায়দা করে মেয়েটিকে লোকটির কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু সে পরে এসে লোকটিকে বলছে, ‘তবে কি জান, ওর মনটা তোমাতে এমন ডুবে আছে যে প্রশ্নই নেই সে অন্য কারুর দিকে তাকাবে’। লম্বা কাহিনী, উপন্যাসটি ভারতীয় সংস্কৃতির অনেক কিছুকে আধার করে লেখা। নামটাও কঠোপনিষদ থেকে নেওয়া, *ক্ষুরস্য ধারা নিশিতয়া দুরত্যয়া*। যখন বস্তুকে নিয়ে কেউ চিন্তা করে; টাকা-পয়সা, কামভাব, ক্ষমতা, তখন তার মন ওই বিষয়ের সঙ্গে এক হয়ে যায়। আর এইসব জিনিসগুলো সংসারের জড় বলে মনটাও জড় হয়ে যায়। কিন্তু যেমনি চৈতন্যের চিন্তা করছেন, সে কি করে বেহেড হবে? এখানে দুটো জিনিস আমাদের বোঝা দরকার।

সাধারণ একটা ঘটনার কথা বলি, আমার এক পরিচিত ব্যক্তি আছেন, ভক্তিমূলক গান শুনলে তাঁর শরীরবোধ চলে যায়। মানে, ওনার শরীরের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না, কুণ্ডলীনি ওঠার মত অবস্থা, যেমন ঠাকুরের অবস্থা হত, সবই সেই রকম। এমনিতে খুব ভাল মানুষ, সাত্বিক লোক। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘অন্য কোন কিছু ব্যাপার, এই আধ্যাত্মিক সম্বন্ধীয় কিছু শুনলে কি শরীরবোধ চলে যায়’? বললেন, ‘না, ওরকম কিছু ব্যাপার নেই’। তখন আমার সন্দেহ হল। আমি নামকরা নিওরোলজিস্ট ডাক্তারের সঙ্গে কথা বললাম। উনি পুরো ঘটনাটা শুনে বললেন, এটা এক ধরণের মৃগী; সিটি স্ক্যান করে চিকিৎসা করা দরকার, নাহলে খুব বিপজ্জনক হয়ে যেতে পারে। প্রথমের দিকে ভদ্রলোকের কথা শুনে আমিও চমকে উঠেছিলাম; ওনার এত কিছু হয়!

তাহলে ঠাকুরকে আমরা অবতার বলে কি করে বুঝব? আর যারা বেহেড হয়ে গেছে, কি করে বুঝব, এটাকি সত্যিই বেহেড নাকি সত্যিই কুণ্ডলীনি জাগরণের প্রভাব? আমাদের কাছে এই ধরণের অনেকেই আসেন, অনেকে এসে বলেন তাঁর ঠাকুরের দর্শন হচ্ছে, নানান রকমের দিব্যদর্শন হচ্ছে। হতেই পারে, দিব্যদর্শন কেন হবে না। আর দিব্যদর্শন হওয়াটা এমন আহামরি কিছু না, যদিও আমার কোন দিন হয়নি। কিছু কিছু লোকের মনের গঠন এমন, তাদের দিব্যদর্শন হয়। ঠাকুরের অনেক কথা ভাগবতে পাবেন, অধ্যাত্ম রামায়ণে পাবেন, রামচরিতমানসে পাবেন, উপনিষদে পাবেন, গীতাতে পাবেন। তাহলে যে কেউ বলতে পারেন, ঠাকুরের কথাগুলো সব বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে। ঠাকুরের অনেকগুলো কথা আবার লৌকিক কথা আছে, তিনি সমাজে যেটা শুনেছেন সেটা বলছেন। আবার এই যে ঠাকুরের সমাধি আদির বর্ণনা, যে ঘটনাটা বললাম, শরীরবোধ চলে যাচ্ছে; তাহলে আপনি কি করে বলবেন, ঠাকুর অবতার? ঠাকুর একজন মহাপুরুষ কি করে আমরা বলব? আসলে এটা বলা যায় না। একজনের সত্যিই দিব্যদর্শন হচ্ছে, নাকি আসলে মাথা খারাপ থেকে হচ্ছে; দুটোকে তফাৎ করা খুব কঠিন হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কয়েকটা জিনিস আছে, যেটা দিয়ে তফাৎ করা যায়।

প্রথম যেটা হয়, দৃষ্টি দিয়ে, শব্দ বা কথা দিয়ে, আর স্পর্শ দিয়ে বা ইচ্ছামাত্র যে কোন লোককে তিনি একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি দিয়ে দিতে পারেন। লীলাপ্রসঙ্গে এই ধরণের বহু ঘটনার বর্ণনা আছে, যেখানে স্বামী সারদানন্দজী বর্ণনা করছেন, অনেককে ঠাকুর স্পর্শ দিয়ে, কথা দিয়ে, দৃষ্টি দিয়ে আধ্যাত্মিক অনুভূতির আস্বাদ করিয়েছেন। স্বামীজীকে স্পর্শ করে দেখিয়ে দিয়েছেন, তাঁর অনেক শিষ্যদের একটু ছুঁয়ে দিয়ে দেখিয়েছেন। কাউকে একটা দুটো কথা বলে দিলেন, তাতেই তার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। আর পয়লা জানুয়ারী তো তিনি ইচ্ছামাত্র করে দিলেন –তোমাদের সকলের চৈতন্য হোক। যাঁদের দিব্যদর্শন হয়, তাঁদের এই ক্ষমতা হয় না। সাধু-মহাত্মাদেরও এই ক্ষমতা থাকবে না।

এই ক্ষমতা একমাত্র অবতারের থাকে। তার সঙ্গে আর-একটা ক্ষমতা, ইচ্ছামাত্র যে কারুর জীবন পরিবর্তন করে দেওয়ার ক্ষমতা। একমাত্র অবতারেরই এই ক্ষমতা থাকে, সচরাচর তিনি এভাবে কারুর জীবন পরিবর্তন করে দেন না, কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে তিনি করেন এবং করে দিতে পারেন। আমাদের সামনে লাটু মহারাজের জীবন আছে, বিহারের অজ গ্রাম থেকে একেবারে নিরক্ষর, কিন্তু জীবনটা তাঁর কেমন হয়ে গেল। স্বামীজীর জীবন কেমন হয়ে গেল।

জীবিত থাকাকালীন এনারা যেখানে থাকেন সেখানে আর বিভিন্ন জায়গায় যে কাউকে দর্শন দিতে পারেন। অবতার যিনি, তাঁর শরীর চলে যাওয়ার পরেও তিনি অনেককে দর্শন দিতে থাকেন। যার জন্য দেখবেন, হঠাৎ হঠাৎ করে কিছু বাবাজীদের খুব নাম হয়ে যায়, টিভির পর্দায়, খবরকাগজের পাতায় পাতায় তাঁদের নাম বেরোয়। কিন্তু এনাদের শরীর চলে যাবার পর আস্তে আস্তে তাঁদের নামটাই মানুষের মন থেকে হারিয়ে যায়। যদি তিনি সন্ত মহাত্মাও হন, যতদিন তিনি বেঁচে আছেন, ততদিন তাঁর নাম লোকের মনে থাকবে। যাঁরা খুব উচ্চ আধারের সন্ত মহাত্মা, তাঁরাও দর্শন দিতে পারেন, স্বপ্নে দর্শন দিতে পারেন, ধ্যানের সময় দিতে পারেন, কিন্তু খুব কম। কিন্তু অবতার মুরি-মুরকির মত দর্শন দেন। শ্রীকৃষ্ণ কত লোককে দর্শন দিচ্ছেন, শ্রীরাম কত লোককে দর্শন দিচ্ছেন। সেইজন্য অবতারকে ঠিক ঠিক চেনা যায় তাঁর অন্তর্ধানের পরে। জীবিত অবস্থায় অবতারকে চেনা খুব মুশকিল।

তৃতীয় যেটা, এটাই হল ফাইনাল টেস্ট। ফলেন পরিচিয়তে, অবতারের যাঁরা শিষ্য, তাঁদের আধ্যাত্মিক ভাব দেখতে হয়। আমাদের অনেক সমস্যা, আমরা সংসারের লোক কিনা। কর্তভজা সম্প্রদায় বা ধর্মজগতে যাদের একটু নামডাক আছে, এনারা মনে করেন আমি বিরাট কিছু হয়ে গেছি, কেউ বলে আমার কাছে এই বড়লোক ভক্তরা আসে, আমার এত শিষ্য। এর সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কি সম্পর্ক আছে আমার জানা নেই। কিন্তু দেখতে হবে সাধু মহাত্মার কাছে যিনি আছেন, তাঁর জীবনে কত পরিবর্তন হল, যার প্রভাবে তিনি ঈশ্বরের দিকে চলে গেছেন।

এই তিনটে উপায় ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই অবতারকে চেনার। বিভিন্ন বইতে অবতারকে চেনার যে কথা বলা থাকে, তাদের সব কথাকেই কাউন্টার করা যায়, কিন্তু এই তিনটেকে কাউন্টার করা যায় না। এখন যদি বলেন, গিরিশ ঘোষ মিথ্যা কথা বলছেন, স্বামীজীও মিথ্যা কথা বলছেন; তাহলে তো বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। কারণ সেই সময় পড়াশোনা করা লোক অনেকেই ছিলেন, যাঁদের দিব্যদর্শন হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় অনেককে ঠাকুর দর্শন দিয়েছেন। ঢাকাতে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে ঠাকুর দর্শন দিয়েছেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কথা শুনে স্বামীজী বলছেন, আমি যখন নিজে দেখেছি তখন কি করে আপনার কথাকে সন্দেহ করি। আধ্যাত্মিক জ্ঞান দেওয়ার ক্ষমতা আর তাঁর শিষ্য যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরকে দেখলেই জানা যাবে ঠাকুর কি ছিলেন। স্বামীজীর শিষ্যরা সবাই ভাল সাধু হয়েছিলেন কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু ঠাকুরের হাতে যাঁরা তৈরী এনারা অন্য জিনিস।

কিন্তু মাথা যদি খারাপ থাকে, বা শুধু দিব্যদর্শনাদি হচ্ছে, কিংবা ফ্রডগিরি করছে, বক্তব্য হল, যারা সেই আধার নয়; এনাদের প্রথম যে জিনিসটা হয়, তা হল, এনাদের যে ব্যক্তিত্ব, যে চরিত্র, এতে ইউনিফরমিটি থাকে না। মাঝে মাঝে খুব ভাল ভাল কথা বলবে, কিন্তু আবার সেখান থেকে কথাগুলো অন্য রকম হয়ে যায়। আমাদের যেমন হয়ে থাকে, এই ঈশ্বরীয় কথা বলছি, আবার একটু পরেই ফালতু জাগতিক সব কথা বলছি। তার মানেই বোঝা যাচ্ছে, এখনও ভিতরটা তৈরী হয়নি।

একটা ঘটনা আগে বলেছিলাম হয়ত, খুব সুন্দর ঘটনা। আমাদের দেওঘর বিদ্যাপীঠে স্বামী পাবনানন্দজী, শম্ভু মহারাজ ছিলেন। বিদেশী ছিলেন, সারা জীবন দেওঘরেই কাটিয়ে দিলেন। একবার দুজন আইএএস অফিসার দেওঘর আশ্রমে এসেছিলেন। একজন দেওঘরের জেলাশাসক, অন্যজন ওনার ব্যাচের একজন। যিনি ব্যাচের একজন, তিনি আগে দেওঘরে এক মাসের মত ছিলেন। একবার তাই দেওঘর আশ্রম দেখতে এসেছেন। বর্তমানে তিনি কর্মস্থলের পরিবর্তন চাইছেন। সেই সময় স্বামী

পাবনানন্দজী মহারাজ এসেছেন। আমি ওনাদের সাথে মহারাজের পরিচয় করালাম। সেই ছেলেটি মহারাজকে চিনতে পেরেছেন, 'হ্যাঁ তখন এখানে একজন সাহেব মহারাজ ছিলেন'। আমি মজা করে বললাম, 'ইনি একজন আইএএস অফিসার, উনি ওনার চাকরিস্থল ছেড়ে এখানে আসতে চাইছেন'। শুনে মহারাজ ইংরাজীতে বলছেন, 'ইনি বর্তমানে যেখানে আছেন সেখানে সন্তুষ্টি নেই, সেখান থেকে মুক্তি চাইছেন; এই করে করে শেষে বৈরাগ্যের শেষ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়'। আমার তখন বয়স কম, শুনে আমি চমকে উঠলাম। দেখুন, এই হচ্ছে পাক্কা সন্ন্যাসীর গুণ। যেখানে আমরা একটা বিষয়ী ভাব দেখছি, মহারাজ সেখানে একটা সেই অসন্তুষ্টির ভাব দেখছেন, যে অসন্তুষ্টি মানুষকে একদিন শ্রেষ্ঠ পথে নিয়ে যায়।

কিং এডওয়ার্ড এক নারীর জন্য ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্য ছেড়ে দিলেন। বিজ্ঞান মহারাজ তখন বলেছিলেন, দেখ এটা হল বৈরাগ্য, আজকে সে এক স্ত্রীর জন্য যে সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত হয় না, সেই সাম্রাজ্য ছেড়ে দিতে পারল, আগামীকাল তো সে ঈশ্বরের জন্য স্ত্রীকেও ছেড়ে দেবে। বৈরাগ্যের দুটো ঘটনা যে বললাম, এটা হল যাঁরা শ্রেষ্ঠ মানের সন্ন্যাসী তাঁরা নিজেরা বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত, ফলে সেখানে তিনি দেখতে পাচ্ছেন বৈরাগ্যের বীজ অঙ্কুরিত হল। কিন্তু যাঁরা সাধারণ মানুষ, তাঁদের মধ্যে ইউনিফাইড পার্সোনালিটিটা থাকে না, ফলে এনাদের শব্দগুলো এলেমেলো হয়। প্রথম হল ব্যক্তিত্ব এক রকম থাকে না, দ্বিতীয় হল, শব্দগুলোর মধ্যে কোন মিল থাকে না। এটাকেই ঠাকুর সহজ ভাষায় বলছেন, আমার মামার গোয়ালে অনেক ঘোড়া আছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা হয়, সেটা হল যখন ঈশ্বরীয় দর্শন হয় তখন তার সাথে একটা আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানটা স্থির থাকে। শুধু ওই জপধ্যান করলাম, জপধ্যান করার ফলে একটু এই দর্শন, সেই দর্শন হয়ে গেল। পাগলও বলে আমি অমুক দেখেছি, তমুক দেখেছি। শ্রীশ্রীমা বলছেন, কত পাপ করলে মানুষ পাগল হয়।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, তুমি যে কথাগুলো বলছ এগুলো প্রমত্তবৎ, ধর্মের কথা বলছ অথচ ধর্ম বোঝ না। এই যে এলেমেলো কথা, কথার মধ্যে ধারাবাহিকতার কোন মিল নেই, ধারাবাহিকতার অভাব যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে মাথায় গোলমাল আছে। ঠাকুরের কোন কথায় ধারাবাহিকতার অভাব পাওয়া যাবে না। এতগুলো কথা জেনেশুনেই বললাম, কারণ আপনাদের মনে অনেক সময় প্রশ্ন আসে, অনেকে হয়ত আপনাদের এগুলোকে নিয়ে প্রশ্ন করবে –ঠাকুরের মাথা খারাপ, ঠাকুরের মৃগী রোগ ছিল। যারা রোগী, যাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ক্ষণিক তারা এক রকম চলে; কিন্তু যাঁদের এরকম তাঁদের আর-এক রকম চলে।

শ্রীযুক্ত মণি সেন অভ্যাগত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের বিদায় করিতেছেন –কাহাকে এক টাকা, কাহাকে দুই টাকা –যে যেমন ব্যক্তি।

ঠাকুরকে পাঁচ টাকা দিতে আসিলেন। এই কথাটা খুব সুন্দর। কাউকে এক টাকা, কাউকে দুই টাকা আর ঠাকুরকে পাঁচ টাকা দিতে আসিলেন। তখনকার দিনে লোকেদের অনেকের মাসে পাঁচ টাকার মাইনে ছিল। **শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেনঃ**

আমার টাকা নিতে নাই। যোগশাস্ত্রে বলছেন, সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ; অপরিগ্রহ মানে কারুর কাছ থেকে কোন উপহার বা কিছু নিতে নেই। ঠাকুরও ওই অবস্থায় ছিলেন। আমাদের নিতে হয়, আশ্রমের কাজের জন্য, বিভিন্ন সেবার জন্য নিতে হয়। ঠাকুর যতটুকু মাইনে পেতেন তাই দিয়ে তাঁর চলে যেত। কিন্তু যখন আধ্যাত্মিক ব্যাপার আসে, তখন সম্পূর্ণ অপরিগ্রহ।

মণি সেন ছাড়ছেন না, তিনি দেবেনই। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীতেও আমরা এই রকম ঘটনা পাই। মা ভক্তদের থেকে নিতেন, আবার অনেক সময় কারুর কারু থেকে নিতেন না। **ঠাকুর তখন বলিলেন, যদি দাও তোমার গুরুর দিব্য**। ঠাকুর কেমন বাচ্চার মত –তোমাকে গুরুর দিব্য দিচ্ছি তুমি আমাকে

টাকা দিও না। কেমন সরল শিশুর মত। যিনি একটু আগে সমাধিতে ছিলেন, সেখান থেকে নেমে এত উচ্চমানের কথা বলছিলেন; সেই তিনিই এখন এক বাচ্চার মত আচরণ করে বলছেন, তোমার অমুকের দিব্য তুমি আমাকে দিও না। **মণি সেন আবার দিতে আসিলেন। তখন ঠাকুর যেন অধৈর্য হইয়া মাস্টারকে বলিতেছেন, "কেমন গো নেব"?**

জানি না আপনাদের কাছে এই ব্যাপারটা কেমন লাগে, আমার কাছে এই প্রসঙ্গটা খুব সুন্দর লাগে, কত কি এক সঙ্গে হচ্ছে। যোগীবর তাঁকে না করে দিচ্ছেন; তাঁকে আরও জোর করা হচ্ছে। ঠাকুর বুঝতে পারছেন না এখন কি করবেন; অর্থচিন্তায় এসে বেহেড হয়ে যাচ্ছেন। **মাস্টার ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে না –কোন মতেই নেবেন না"**। মাস্টারমশাইও এতদিনে বুঝতে পারছেন, ঠাকুর কি রকম, দেখে খুব ভাল লাগছে।

শ্রীযুক্ত মণি সেনের লোকেরা তখন আম সন্দেশ কিনিবার নাম করিয়া রাখালের হস্তে টাকা দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) –আমি গুরুর দিব্য দিয়েছি। –আমি এখন খালাস। রাখাল নিয়েছে সে এখন বুঝুগগে। রাখালের তখন বয়স কম ছিল, তিনি হয়ত জিনিসটা বুঝলেন না যে, ঠাকুর নিতে চাইছেন না, সেখানে তাঁর না নেওয়াটাই ঠিক ছিল, তা আম সন্দেশ কেনার নাম করে দিলেই বা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে গাড়িতে আরোহণ করিলেন –দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ফিরিয়া যাইবেন।

পথে মতিশীলের ঠাকুরবাড়ি। ঠাকুর মাস্টারকে অনেকদিন হইল বলিতেছেন –একসঙ্গে আসিয়া এই ঠাকুরবাড়ির ঝিল দর্শন করিবেন –নিরাকার ধ্যান কিরূপ আরোপ করিতে হয়, শিখাইবার জন্য। বেলঘরিয়ার দিকে মতিশীলের ঠাকুরবাড়ি। আমরা মহারাজরা অনেকে মিলে একবার গিয়েছিলাম।

ঠাকুরের খুব সর্দি হইয়াছে। জুন মাস, ঠাকুরের সর্দিকাশি লেগে থাকত। **তথাপি ভক্তসঙ্গে ঠাকুরবাড়ি দেখিবার জন্য গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন**।

ঠাকুরবাড়িতে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা আছে। ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহের সামনে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করিলেন।

এইবার ঠাকুরবাড়ির পূর্বাংশে যে ঝিল আছে তাহার ঘাটে আসিয়া ঝিল ও মৎস্য দর্শন করিতেছেন। কেহ মাছগুলির হিংসা করে না, তার মানে কেউ ওখানে মাছ ধরে না, ফলে মাছগুলো বড় বড় হয়ে গেছে। **মুড়ি ইত্যাদি খাবার জিনিস কিছু দিলেই বড় বড় মাছ দলে দলে সম্মুখে আসিয়া ভক্ষণ করে –তারপর নির্ভয়ে আনন্দে লীলা করিতে করিতে জলমধ্যে বিচরণ করে**।

আমি এক সময় ছাপড়ার আশ্রমে ছিলাম। ওখান থেকে অনেক দূরে আমাকে এক শিবমন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানেও একটা বিশাল দীঘি আর সেই দীঘিতে বিশাল বিশাল রুই মাছ আনন্দে খেলা করছে। ওখানেও মুড়ি কিনতে পাওয়া যায়। প্রথমে দীঘির জল দেখে মনে হল জলটা কালো। পরে দেখছি, রুই মাছের পিঠের দিকটা কালো বলে পুরো জলটাকে কালো দেখাচ্ছে। মুড়ি খেতে দিলে মাছগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে খাচ্ছে, তখন পুরো জলটা সাদা হয়ে যাচ্ছে। রুই মাছের পেটের দিকটা সাদা থাকে। নিজের মত মাছগুলো জলের মধ্যে বিচরণ করছে।

ঠাকুর মাস্টারকে বলিতেছেন, "এই দেখ, কেমন মাছগুলি। এইরূপ চিদানন্দ-সাগরে এই মাছের ন্যায় আনন্দে বিচরণ করা।

আপনাদের মনে করিয়ে দিই। কথামৃতের প্রথমের দিকে মাস্টারমশাই প্রশ্ন করেছিলেন, প্রতিমা পূজা ঠিক কিনা? নিরাকার নিরাকার লোকেরা বলে ঠিকই, কিন্তু নিরাকারের উপাসনা করা কঠিন। ঠাকুর দেখাচ্ছেন, এই যে মাছগুলো দেখছ এরা কেমন নির্ভয়ে বিচরণ করছে। আপনারা অনেকেই প্রচুর জপধ্যান করেন। আপনাদের গুরু বলে দিয়েছেন কিভাবে ইষ্টের ধ্যান করতে হবে। কিন্তু যাঁরা আধ ঘন্টা, এক ঘন্টা জপ করেন তাঁদের দ্বারা ধ্যান করা সম্ভব না, কারণ জপ করতে করতেই অনেক সময় চলে যায়। কিন্তু যাঁরা অনেক বেশি সময় নিয়ে জপধ্যান করেন, তাঁদের বিভিন্ন রকমের ধ্যান করতে হয়। তার মধ্যে এই যে ধ্যানের কথা ঠাকুর বলছেন, যেখানে তিনি আরোপ করতে বলছেন।

এই সচ্চিদানন্দ সাগর, সেই সচ্চিদানন্দই তো শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণরূপী যে সমুদ্র, ওখানে মাছের মত নির্ভয়ে বিচরণ করা। রামকৃষ্ণরূপী সমুদ্রে আর কিছু নেই। কি আছে? শুধু সচ্চিদানন্দরূপী জল। এরপর বাকি যা কিছু হয়, ওই চৈতন্যের বোধ, আনন্দের বোধ; এগুলো সময়ের সঙ্গে হবে। কিন্তু ওই বোধ, কোথাও কিছু নেই। কি আছে? আমি আর আমার ইষ্ট। আমার ইষ্ট কি রকম? অনন্ত সমুদ্রের মত। সেই অনন্ত সমুদ্রের মধ্যে আপনি যে সেই জীব, কারণ পাখিকে দিয়ে যদি উপমা করা যায়, ওটা হয় না, কারণ আকাশে সূর্য আদি অনেক কিছু থাকে।

কিন্তু এই জিনিসটাকে যদি চিন্তন করা যায়, সমুদ্র যার কোন কুল-কিনারা নেই, অনন্ত; তার মধ্যে আপনি আনন্দ করছেন। কি রকম? ছোট শিশু মায়ের দুগ্ধ পান করে নেওয়ার পর মায়ের কোলে যেমন আনন্দে হাত-পা ছুড়তে থাকে, সেই রকম। এই রকম ধ্যান যদি করা হয়, তাহলে অনেকক্ষণ কেটে যাবে, সময় কোথা দিয়ে চলে যাবে বোঝা যাবে না। আর ঠাকুরের ভাবে ডুবে আছেন। এখানে যখন মাস্টারমশাইকে দেখানো হচ্ছে, এটা দেখানো হচ্ছে নিরাকার ধ্যান। কিন্তু নিরাকার সাকার ধ্যানে কোন তফাৎ থাকে না। ঠিক ঠিক নিরাকার ধ্যান হল –নেতি নেতি। কিন্তু মাস্টারমশাই নিরাকার নিরাকার করতেন ঠিকই, নিরাকারের লোক হওয়া সহজ না। ঠাকুর দেখাচ্ছেন, এভাবে নিরাকারের ধ্যান করতে হয়। প্রসঙ্গ এখানেই শেষ, এরপর ২৫শে জুনের বর্ণনা আসবে।